জুন ২০২৬ □ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

গাছের ছায়ায় গাছের মায়ায়

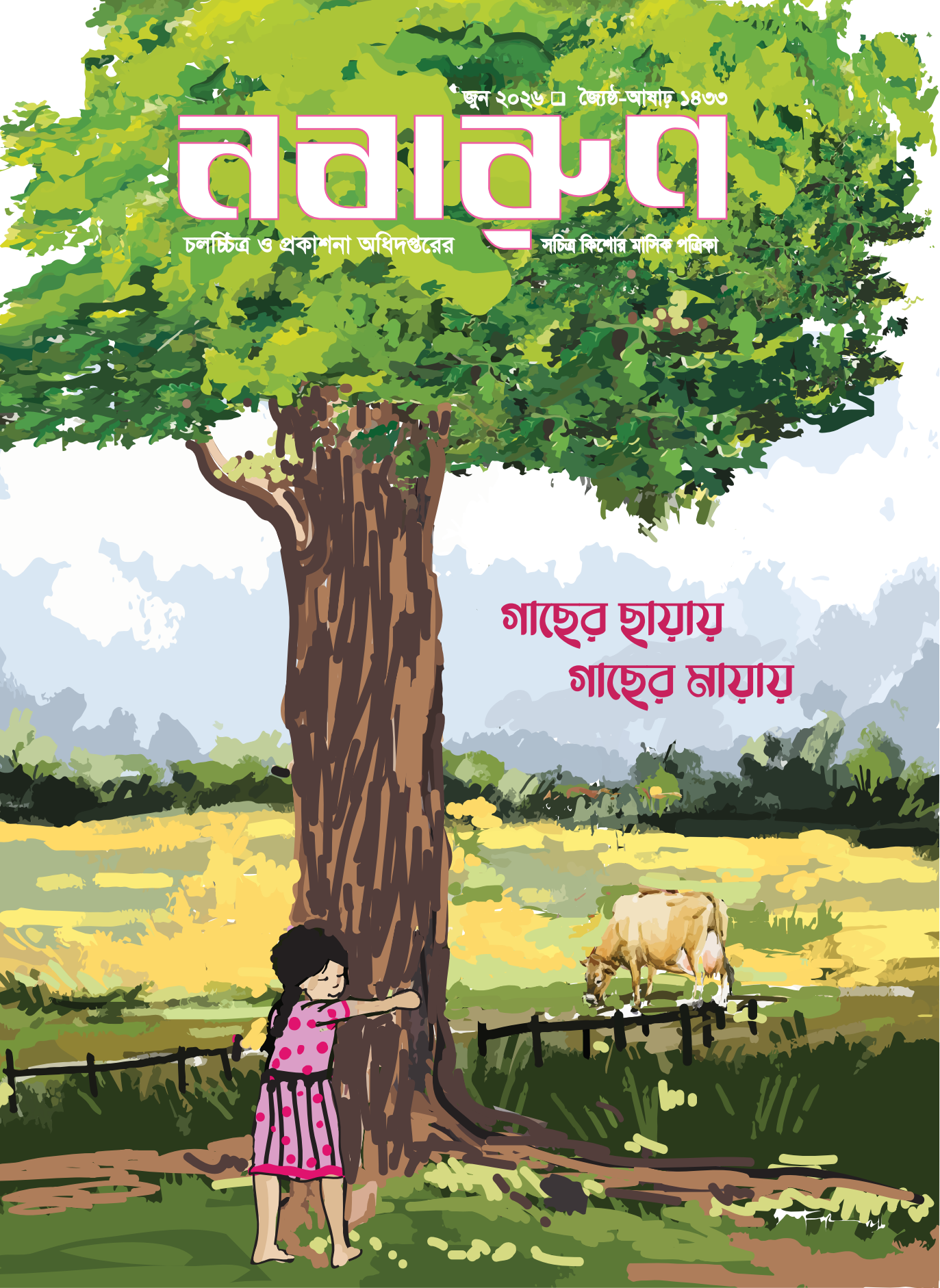



জয়া ওয়ালিয়া, ষষ্ঠ শ্রেণি, ধানমন্ডি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



সাইয়ান খান, ষষ্ঠ শ্রেণি, মুকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয় দোহার, ঢাকা

সম্পাদকীয়

প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো 'প্রকৃতির অনুপ্রেরণায়, জলবায়ুর সুরক্ষায়, গড়বো ভবিষ্যৎ'। পরিবেশ দিবস মনে করিয়ে দেয় এই পৃথিবী আমাদের ঘর। পৃথিবী নামক ঘরে আমরা বাস করি। তাই পৃথিবীকে সুন্দর সবুজ, বাস উপযোগী রাখতে হবে। দিনে দিনে পৃথিবী তার সবুজ হারিয়ে ফেলছে। গাছপালা কেটে বন উজাড় করার কারণে বাতাসে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমান বেড়ে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে, পৃথিবীর সমুদ্র তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল পানির নীচে তলিয়ে যাচ্ছে, উষ্ণতা, ঝড়-বৃষ্টি বাড়ছে। পলিথিন, প্লাস্টিকের ব্যবহার, কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য, ধোঁয়ার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সকলের সচেতনতাই পারে পরিবেশ দূষণ কমাতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বাঁচাতে। পরিবেশ, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে।

জুন মাসের আরেকটি অসাধারণ দিবস 'বিশ্ব বাবা দিবস'। ছায়া হয়ে, আশ্রয় হয়ে যিনি আমাদের ভালোবেসে আগলে রাখেন তিনি আমাদের বাবা। বাবার ভালোবাসা, শাসন এবং উপদেশ আমাদের জীবনের ভিত তৈরি করে দেয়। জানাই বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আমরা আমাদের পৃথিবী, প্রকৃতি, পরিবারকে ভালোবাসবো। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবো। দেশকে ভালোবাসব, নিজেকে ভালোবাসব আর নবারুণের সাথেই থাকব।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
☎ ০২-৮৩০০৬৮৮
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
☎ ০২-৮৩০০৭০২

চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

০৭ প্রকৃতি ও পরিবেশ/ জায়েদুল আলম
১৪ বিশ্ব পরিবেশ দিবস/ আইউব সৈয়দ
২০ বাবা দিবসের কথা/ ইব্রাহীম রাজু
৩৪ ধুমকলার ইতিকথা/ আবিদ করিম মুন্না
৪৪ জাতীয় ফুলের স্বীকৃতির গল্প/ হুমায়ূন কবির
৫২ নীলগাই কেন নীল নয়/ রুবাইয়াত খান
৫৬ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়/ মেজবাউল হক
৫৭ বিশ্ব কীটপতঙ্গ দিবস/ রামিসা হক
৬০ তনিমার আকাশ ছোঁয়া সাফল্য আতিকুল ইসলাম
৬২ সবুজ রহস্যের মায়াজালে/ লাইজু চৌধুরী

স্মৃতিকথা

২২ বাবার কাছে চিঠি/ শারমিন নাহার ঝর্ণা

গল্প

০৩ রোদ-কুড়ানি মেয়ে আর মেঘের ওড়না/ নূহু আব্দুল্লাহ
১০ গাছের ছায়া গাছের মায়া ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান
১৬ তৃষার বুদ্ধি/ মো. নজরুল হাসান ছোটন
২৫ জীবিত ভূতনাগিনী/নাসীমুল বারী
২৯ ম্যাজিক মামা/ সত্যজিৎ বিশ্বাস
৩২ মানুষই হবে মানুষের বন্ধু/ সারমিন ইসলাম রত্না
৩৬ পাথর কন্যা/ মামুন সরকার
৪১ সাঁতারু/ নাসরীন খান
৫০ বৃষ্টি বাড়ির রহস্য/ পিন্টু রহমান
৫৪ রাতুলের লাল ছাতা/ মেহেরুন ইসলাম

কবিতাগুচ্ছ

০৬ জাকির আবু জাফর
১৮ আসাদুজ্জামান খান মুকুল/ মাহমুদুল হাসান
১৯ বেণীমাধব সরকার/ ইউনুস আহমেদ মো. জাকির হোসেন
২৩ মো. ইকবাল করিম/ মো. মিজানুর রহমান নজরুল ইসলাম বাদল/ আতিক রহমান
২৪ আহসানুল হক/ নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল খলিলুর রহমান বাবু
৩১ আহমেদ টিকু/ মোশতাক আহমেদ হাফিজ রশিদ খান
৩৫ মিয়াজান কবীর
৪৮ শিউলি আক্তার
৪৯ আরিফ হোসেন সবুজ

ছোটোদের ছড়া

০৫ রোকেয়া আক্তার (সাথি)/ কায়নাত মারিয়া প্রাপ্তি
১৮ কাজী জাবির আহমেদ
৩৩ মাইশা মাহজাবিন
৪৮ সানজিদা অপু/ আরিয়ান ইসলাম সোহান
৪৯ শাহরিয়ার আলম ঋদ্ধ/ রাকিব আহমেদ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : জয়া ওয়ালিয়া/ সাইয়ান খান
তৃতীয় প্রচ্ছদ : রায়হান কামাল/ সাইফান মাসুদ আলী
শেষ প্রচ্ছদ : তুবা ইয়াসমিন হিয়া
৬৪ নূর এ মাহদী নবী আভা/ সাজ্জাদ হোসেন শান্ত

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd



রোদ-কুড়ানি মেয়ে আর মেঘের ওড়না

নূহ আব্দুল্লাহ

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটা গ্রাম, নাম তার ছায়াপুঞ্জি। গ্রামটি দেখতে রূপকথার মতো সুন্দর হলেও একটা বড়ো সমস্যা ছিল, সেখানে কোনো বিদ্যুৎ ছিল না। সূর্য ডুবলেই পুরো গ্রাম যেন এক ঘন অন্ধকারের চাদরে ঢাকা পড়ে যেত।

এই গ্রামে থাকে ধীর-স্থির, বুদ্ধিমতি একটি মেয়ে নাম তার হিয়া। সে মাঝেমাঝে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। হিয়া খেয়াল করেছিল, সন্ধ্যা হলেই যখন গ্রামের বড়োরা কেরোসিনের কুপি কিংবা লাকড়ি জ্বালাত, তখন চারপাশে একটা কালো ধোঁয়া তৈরি হতো। সেই ধোঁয়া ওপরে উঠে পাহাড়ের মাথায় থাকা সাদা মেঘগুলোকে কালচে করে দিত।

একদিন গ্রামের মোড়ল ঘোষণা করলেন, 'এভাবে আর অন্ধকারে থাকা যায় না। আমরা পাহাড়ের সবুজ জঙ্গল কেটে কয়লা পোড়ানোর একটা বড়ো কারখানা তৈরি করব। সেখান থেকে ধোঁয়া বের হবে ঠিকই, কিন্তু আমাদের গ্রামে আলো আসবে।'

ঘোষণাটি শুনে গ্রামের সবাই খুশি হলেও হিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। জঙ্গল কেটে ফেললে পাখিরা কোথায় যাবে? পাহাড়ের কী হবে? সে পরদিন মন

খারাপ করে পাহাড়ে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল। তখন দুপুর, কড়া রোদ চারদিকে। হিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, এক টুকরো সাদা মেঘ সূর্যের সামনে এসে রোদকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ হিয়া শুনতে পেল একটা খিলখিল হাসির শব্দ। সে দেখতে পেল, মেঘের আড়াল থেকে একটা উজ্জ্বল, সোনালি রঙের আলোর পুতুল নেমে আসছে। তার গা থেকে এত তেজি আলো বের হচ্ছে যে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

হিয়া চোখ হাত দিয়ে ঢেকে বলল, 'তুমি কে?'

আলোর পুতুলটি মিষ্টি গলায় বলল, 'আমি রোদ'। আর ওই যে দেখছ নীলাকাশ জুড়ে ছড়ানো, ওটা হলো আমার বন্ধু মেঘের ওড়না। কিন্তু তোমরা মানুষরা ইদানীং এত কালো ধোঁয়া ছাড়ছ যে মেঘের ওড়নাটা ময়লা হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি আর মেঘ আজকাল খুব ঝগড়া করি।'

হিয়া আফসোস করে বলল, 'আমাদের গ্রামে আলো নেই তো, তাই বড়োরা এবার কয়লার কারখানা বানাবে। তখন আরো ধোঁয়া হবে, তোমার বন্ধুর ওড়না একদম আলকাতরার মতো কালো হয়ে যাবে।'

রোদ একটু হেসে বলল, 'মানুষেরা এত বোকা কেন হিয়া? আলোর জন্য কয়লা পুড়িয়ে প্রকৃতি ধ্বংস করার কী দরকার? আমি রোজ আলো নিয়ে পৃথিবীতে আসি। তোমরা আমাকে কুড়িয়ে নাও না কেন?'

'রোদ আবার কীভাবে কুড়ায়?' হিয়া অবাক।

রোদ তখন হিয়াকে একটা বুদ্ধি দিল। সে বলল, 'তোমাদের স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষককে গিয়ে বলো 'রোদের আয়না' বা সোলার প্যানেলের কথা। সেই আয়নাগুলো রোদের দিকে মুখ করে রাখলে, আমি সারাদিন সেখানে আমার শক্তি জমা করে দেবো। আর রাতে সেই শক্তি দিয়ে তোমাদের পুরো গ্রাম আলোয় ঝলমল করে উঠবে। এর জন্য একটা গাছও কাটতে হবে না।'



হিয়া আর দেরি করল না। সে পাহাড় থেকে নেমে সোজা দৌড়ে গেল তাদের স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক মশাই তার কথা শুনে চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, 'তুমি তো দারুণ কথা বলেছ হিয়া! আমাদের সরকার তো এখন সৌরবিদ্যুৎ বা সোলার এনার্জির ওপর জোর দিছে। আমরা চাইলে আবেদন করে আমাদের গ্রামের জন্য সোলার প্যানেল নিয়ে আসতে পারি।'

পরদিন শিক্ষক মশাই আর হিয়া মিলে গ্রামের সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জড়ো করল। তারা মোড়ল মশাই আর গ্রামের বড়োদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হিয়া খুব সহজ করে সবাইকে বোঝালো যে, পাহাড় কাটলে কীভাবে ধস নামবে, আর কয়লার ধোঁয়ায় সবার অসুখ হবে। তার চেয়ে রোদ-কুড়ানি এই জাদুর আয়না অনেক ভালো।

শিক্ষক মশাই মোড়লকে সোলার প্যানেলের একটা ছোটো মডেল বানিয়ে দেখালেন। বড়োরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি, কিন্তু বাচ্চাদের জেদ আর শিক্ষকের অকাট্য যুক্তির কাছে তারা হার মানে। তারপর কয়লা কারখানার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

কয়েক মাসের মধ্যে ছায়াপুঞ্জি গ্রামের প্রতিটি বাড়ির ছাদে আর পাহাড়ের ঢালে বসে গেল নীলচে রঙের সোলার প্যানেল। প্রথম যে রাতে সুইচ অন করা হলো, পুরো গ্রাম জাদুর মতো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। কোনো ধোঁয়া নেই, কোনো গন্ধ নেই, কেবলই পরিষ্কার আর নিখাদ আলো।

হিয়া সে রাতে ছাদে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, চাঁদের আলোয় পাহাড়ের মাথার মেঘের ওড়নাটা আজ ধবধবে সাদা রেশমের মতো চকচক করছে। আর দূর থেকে একটা সোনালি আলোর কণা যেন তাকে দেখে চোখ টিপল। হিয়া হাসল, কারণ সে জানে সোনালি আলোর কণাটা খুশি হয়েছে। আর এখন সে নিজে একজন সফল 'রোদ-কুড়ানি মেয়ে'। ❑

সাংবাদিক ও লেখক

সবুজ পৃথিবী

রোকেয়া আক্তার (সাথি)

এসো সবাই গাছ লাগাই
পথের দুই ধারে,
সবুজে ভরে উঠুক
মাঠঘাট সবার তরে।

নদীর জলে ফেলব না আর
ময়লা-আবর্জনা
স্বচ্ছ জল ভরে উঠুক
মাছের আপন ঠিকানা।

পলিথিনের ব্যবহার
করব না আর
পরিছন্ন পৃথিবী গড়ি
এটাই হোক অঙ্গীকার।

দশম শ্রেণি, মোরেলগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাগেরহাট

প্রকৃতি

কায়নাত মারিয়া প্রাপ্তি

পাখিরা ফিরে আসুক
বনের আপন নীড়ে,
ফুলে ফলে ভরে উঠুক
এই দেশ ধীরে ধীরে।

শিশুরা শিখুক
প্রকৃতিকে ভালোবাসতে,
পরিবেশের জন্য কাজ করতে,
পরিবেশ বাঁচাতে, পাশে দাঁড়াতে।

আজকের ছোট্ট প্রয়াস
বড়ো হবে কাল,
সবুজ পৃথিবী গড়াই
হোক সবার খেয়াল।

নবম শ্রেণি, হাসান আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চাঁদপুর

এই পরিবেশ সেই পরিবেশ

জাকির আবু জাফর

সবুজ জুড়ে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের বুক
চোখ জুড়ানো মন ভরানো ছড়ানো উন্মুখ।
রৌদ্র ছায়ায় কোমল হওয়া গ্রীষ্ম ভরা ঘাম
ফুলের ঋতু পেরিয়ে আসে বৈশাখি উদ্যাম।

বৃক্ষ থেকে বৃষ্টি এবং আকাশ থেকে ভূমি
রং-বেরঙের ঋতুর দোলায় বিচিত্র মৌসুমি।
মৌমাছি আর ভোমর কিংবা প্রজাপতির দল
কিংবা হাজার ঝাঁক বাঁধা সব পাখির কোলাহল।

দোয়েল কোয়েল কোকিল টিয়ে ময়না শ্যামার গান
সুরের দোলায় দুলতে থাকে স্বপ্ন অফুরান।
চতুর্দিকে দৃষ্টি কাড়া মধুর পরিবেশ
এমন মায়ায় জড়িয়ে আছে আমার বাংলাদেশ।

কিন্তু এখন বাংলাদেশের বাতাস বড়ো ভারী
বুক ভরিয়ে আগের মতো শ্বাস কি নিতে পারি!
আগের মতো প্রাণের সাথে প্রাণ কি দুলে ওঠে
বনান্তরের বুকের ভেতর পলাশ শিমুল ফোটে!

ঘাসের বুকে হয়ত শিশির আগের মতো ঝরে
হয়ত হিজল মেলছে ছায়া শ্যামল বনান্তরে।
কিন্তু ছায়ার সেই মায়াবী আরাম কি আর আছে
বিবর্ণ সব বৃক্ষরাজি ধোঁয়া ধূলির কাছে।

বিশ্বজুড়ে পরিবেশের এই যে বিপর্যয়
রুখতে হবে, রাখতে হবে জীবন সুনিশ্চয়!
সবুজ থাকুক সবুজ রঙে, ফুলের গন্ধ সেই
এই পরিবেশ রক্ষা করার বিকল্প আর নেই।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

জায়েদুল আলম

একসময় প্রকৃতির সাথে মানুষের বন্ধুত্ব ছিল। তখন মানুষ প্রকৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। আজ প্রকৃতি মানুষের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ চাইলে প্রকৃতি সুরক্ষিত রাখতে পারে; আবার মানুষ চাইলে প্রকৃতি ধ্বংসও করতে পারে। ছোটোবেলায় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেখতাম মুষলধারে বৃষ্টি হতো; আর এখন এই সময়ে তাপদাহে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ছে। অনেক দেশে অধিক তাপমাত্রায় মানুষ মারা যায়। বৃষ্টি ছাড়া ঋতুরাজ বর্ষা আজ রাজ্যহারা। শুধু বর্ষা নয়; খেয়াল করলে বুঝা যায় কোনো ঋতু তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকৃতিতে আর আগমন করে না। প্রকৃতি এখন আগের মতো চিরচেনা নয়।



আমাদের ছোটোবেলায় প্রকৃতি ও পরিবেশ এখনকার তুলনায় অনেক বেশি দূষণমুক্ত, সবুজ ও ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। মানবসভ্যতার বিকাশ, শিল্পায়ন এবং নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে প্রকৃতি তার আদি রূপ অনেকটাই হারিয়েছে। আমাদের অতীতের সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে ছিল আলাদা। যেমন-

গাছপালা ও বনভূমি: একসময় চারপাশ ঘন সবুজ বন, বাঁশঝাড় ও বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ভরা ছিল। এখনকার মতো কংক্রিটের শহর বা ইটভাটার আধিপত্য ছিল না।

বিশুদ্ধ বায়ু ও পানি: নদী, খাল ও বিলের পানি ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ এবং ব্যবহার উপযোগী। বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্যাস বা কালো ধোঁয়ার উপস্থিতি না থাকায় বাতাসও ছিল বিশুদ্ধ।

জীববৈচিত্র্য: বাঘ, হরিণ, শকুনসহ অসংখ্য বন্য প্রাণী ও দেশীয় প্রজাতির মাছের অবাধ বিচরণ ও বংশবৃদ্ধি ছিল। অনেক পশুপাখি আজ বিলুপ্ত।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া: ঋতুচক্র ছিল খুবই নিয়মিত। গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত- প্রত্যেকটি ঋতু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সময়মতো আসত।

আগে আমাদের ছোটোবেলায় একটা সময় ছিল পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও শ্রদ্ধাশীল। মানুষ প্রকৃতির ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। মূলত পরিবেশ বলতে বোঝায় সমগ্র জীবজগৎ (মানুষকে বাদ দিয়ে) এবং প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, যাকে আমরা বলি ধরিত্রী বা প্রকৃতি। মাটি-জলাশয়, নদী-সাগর, বৃক্ষলতা-বন-বনানী, পাহাড়-অরণ্য, জীবজন্তু আর মাথার উপরে শূন্যে দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ।

দিন দিন পরিবেশ ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। মানুষ নিষ্ঠুরভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিনাশ করছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, শব্দদূষণ; চারদিকে দূষণ আর দূষণ।

এক সময় পৃথিবীতে কোনো প্রাণের স্পন্দন ছিল না তখন। তারপর প্রাকৃতিক-নিয়মেই জন্মেছিল তৃণ ও লতাগুল্ম, গাছপালা ও প্রাণিকুল। পৃথিবী ভরে গেল ফুল ও ফলের বিচিত্র্য সম্ভারে আর গাছ-গাছালি-পাহাড়-অরণ্যে। কত কোটি বছর পেরিয়ে গেল এভাবে। তারপর প্রকৃতির আপন খেয়ালে পৃথিবীতে এল প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ



বুদ্ধিমান জীব— মানুষ। আর এই মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ পাহাড়-পর্বত ঘেরা অরণ্যই ছিল মানুষের আদি বসতি। মানুষ বাস করত নিরাপদে। পাহাড়, নদী-ঝরনার কলগুঞ্জনে ও পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হতো আকাশ-বাতাস, পুলকিত হতো মানুষের মন। বনের পশু-পাখিরা বাস করত স্বাধীনভাবে, অরণ্যের আড়ালে-আবডালে নিভৃত প্রকৃতির সহজাত ভঙ্গিতে, স্বতঃস্ফূর্ত মহিমায়। শত-সহস্র প্রজাতির নাম না জানা পাখিরা গান গাইত আপন মনে। সেই পশু-পাখিদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা আজ বিঘ্নিত। অস্তিত্ব বিপন্ন। মানুষের জীবনের তাগিদে কুঠারের আঘাত পড়ল সবুজ অরণ্যে। বনজঙ্গল, সাফ করে মানুষ গড়ে তুলল বসতি, রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, শহর-বন্দর-নগর, লোকালয় ও কল-কারখানা। পাখির কিচির মিচির, কুহু-কেকার কলকাকলিতে আমাদের ঘুম এখন আর ভাঙে না। হারিয়ে গেছে সেই সব সোনালি দিন, যেদিন বাড়ির আঙিনায় গাছে পাতার আড়ালে নেচে নেচে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াত দোয়েল, কোয়েল, ফিঙে আর বুলবুলি। বাড়ি বাড়ি আম, জাম, পেঁপে, কলা ও কাঁঠালের বাগান আর নেই। নেই পুকুর পাড়ে ঝোপঝাড়, বাঁশ বাগানে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর রাতের আঁধারে পদ্মদিঘিতে শতসহস্র জোনাকির আলো। আজ এসব শুধুই অতীতের স্মৃতি।

প্রাকৃতিক ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশে বনভূমির হার মোট ভূমির মাত্র ৬.৭ শতাংশ। বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে, ফলে বিশ্ব-পরিবেশও এখন হুমকির মুখে। মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রয়োজনে গাছপালা-বৃক্ষরাজি অপরিহার্য। জীবনের অপরিহার্য উপাদান পানি ও বায়ু। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে দেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিনের পর দিন দ্রুত নীচে নেমে যাছে। এই বিপর্যয় পর্যাপ্ত পরিমাণে বনভূমি গাছপালা না থাকারই ফল। এই প্রেক্ষাপটে দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলোর আবহাওয়ায় অনেকদিন ধরেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দিনের বেলায় দুঃসহ গরম আর রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, এ লক্ষণ মরুকরণ প্রক্রিয়ার আশঙ্কাজনক পূর্বাভাস।

এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে বনায়নের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা প্রস্বেদন-প্রক্রিয়া এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে আবহাওয়া মণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখে, বাতাসের আর্দ্রতা বাড়িয়ে বায়ুমণ্ডলকে রাখে শীতল। আবার বৃষ্টি ঝরিয়ে ভূমিতে পানির পরিমাণ বাড়ায় এবং মাটির জলধারণে সক্ষমতা সৃষ্টি করে। তাই বনভূমিকে গণ্য করা হয় বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধকরণ ও শীতলকরণের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে। এছাড়া গাছপালা মাটির উর্বরতাশক্তি বাড়ায়, মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা রোধেও পালন করে সহায়ক ভূমিকা। নদী-সাগরের ছাপিয়ে আসা বন্যা থেকে লোকালয় রক্ষা করে। আর মাটির উপর শীতল ছায়া বিছিয়ে মরুকরণ রোধ করে।

আমরা মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির মাঝে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। আমাদের মূল স্বত্ত্বা ও অস্তিত্বের সঙ্গে প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে-কোনো মূল্যে প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। বর্তমান বিশ্বে নগরায়ন ও শিল্পায়ন সমৃদ্ধ দেশসমূহের বিষাক্ত শিল্পবর্জ্য ও বিষাক্ত গ্যাস এবং দূষিত বায়ুদূষণের বিষক্রিয়ায় প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। প্রকৃতি ও সমাজযন্ত্রকে শোষণ না করে, প্রকৃতিকে তার স্বরূপ রেখে উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও মানবতার বিকাশ তথা মানবিকতার মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে এগিয়ে যাওয়াই স্বছতা। দেশপ্রেমের নিবেদিত স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও প্রগতির মূলভিত্তি। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষ ও অন্যান্য জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। এগুলোর ক্ষতি করা হলে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য থাকে না। তাই স্বাস্থ্যসম্মত পরিছন্ন পরিবেশ এবং উন্নত জীবনমান পদ্ধতি একে অপরের পরিপূরক। ❑

শিক্ষাবিদ ও লেখক

গল্প



গাছের ছায়া গাছের মায়া

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

স্কুল বন্ধ। বন্ধের কারণ হলো বন্যা। বন্যার পানিতে থইথই চারদিক। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। পানিতে প্রচুর স্রোত। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য মরা গরু, ছাগল, ভেড়া...!

ইরা ভয় পাছে! ইরাদের বাড়ির চারদিকে পানি। পানির মাঝখানে ভেসে আছে শুধু বাড়িটি। বাড়ির চারদিকে মাটির মোটা দেয়াল। দেয়ালের পাশে সারিবদ্ধ গাছ। আম, জাম, নারিকেল, তাল, নিম, নিসিন্দা, শিরীষ, অর্জুনসহ অনেক গাছ। ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাবার

সাথে বন্যার পানি দেখছে ইরা। বাবা ইরাকে সাহস দিচ্ছেন। সাহস দিয়ে বলছেন- ভয় পেয়ো না মামণি। আমাদের বাড়িটি মাটির দেয়ালঘেরা। চওড়া এবং উঁচু দেয়াল। সহজে ভাঙবে না। বাড়িতে ঢোকার গেইটেও উঁচু করে বাঁধ দিয়েছি। তুমি ভয় পেয়ো না।

ইরা কাঁপা গলায় বলে- এত পানি দেখে ভয় পাছি বাবা। আমাদের বাড়িতে পানি ঢুকে যদি আমাদের বাড়ি ডুবে যায়?

বাবা ইরাকে সাহস দিয়ে বুঝিয়ে বললেন— আমাদের বাড়িতে পানি ঢুকবে না মা। বাড়ির চারপাশে মাটির দেয়াল বেশ চওড়া এবং উঁচু। গেইটের বাঁধের দিকেও খেয়াল আছে। তুমি ভয় পেয়ো না। এই যে গাছগুলো দেখছ, এগুলো আমাদের বাঁচাবে। এরা আমাদের বন্ধু।

ইরা বাবাকে প্রশ্ন করে- গাছ কীভাবে বাঁচাবে বাবা?

এই যে বড়ো-বড়ো গাছের শেকড় মাটিকে ধরে আছে। গাছের শেকড় মাটির ক্ষয় রোধ করে। এরা আমাদের দেয়াল ভাঙতে দেবে না।

বাবার কথা শুনে ইরা সাহস পেল। সাহস পেয়ে বলল- তুমি ঠিক বলেছ বাবা। আমি ভূগোল ও পৌরনীতি বইয়ে পড়েছি গাছের শেকড় মাটির ক্ষয় রোধ করে। গাছ আমাদের বন্ধু। এরা আমাদের অক্সিজেন দেয়, ঝড়-তুফান, বন্যা-বাদল থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আমাদেরকে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

হ্যাঁ, আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। গাছ আমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

স্কুলের কথা মনে পড়ছে বাবা। আমার স্কুলের ছাত্রছাত্রী, আমার সহপাঠীদের কথা মনে পড়ছে। কদিন ধরে স্কুলে যাই না। স্কুলের ভেতরেও নাকি পানি ঢুকেছে। স্কুলের লাইব্রেরিতে অনেক বই। এগুলো ভিজে যাবে। আমাদের বাড়ির মতো তো সবার বাড়ি নয়। ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই পানি ঢুকেছে। জানি না, কে কেমন আছে? আমার খুব ভয় হচ্ছে বাবা!

বাবা ইরাকে আবার বললেন- তুমি আমার সাহসী মেয়ে। ভয় পেলে হয়? বিপদে ভয় পেতে নেই। ভয় পেলে বিপদ মোকাবিলা করা যায় না। তোমাদের স্কুলে পানি ঢুকলেও বইপত্র নষ্ট হবে না। কারণ, বন্যার শুরুতেই তোমাদের স্কুল বন্ধ দেওয়া হয়েছে। তখন এত পানি ছিল না। তোমাদের স্কুলের হেড স্যার আর ম্যাডাম সতর্ক ছিলেন। ওনারা নিশ্চয়ই আগাম প্রস্তুতি নিয়েছেন। বন্যার পানি বাড়ার আভাস পেয়ে অনেকেই বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। যাদের বাড়ি নিচু তারা জানে, বন্যার সময় তাদের বাড়িতে পানি উঠবে। তাই তারা আগে থেকেই সতর্ক ছিল।

তাহলে এত মরা প্রাণী কোথা থেকে আসছে বাবা?

এগুলো দূর থেকে এসেছে। এই বন্যার পানি উজানের। এই পানি ভারত থেকে বাংলাদেশে নামছে। আগে ওদের দেশে বন্যা হয়েছে, পরে আমাদের।

এর কোনো সমাধান নেই বাবা?

আছে মা, বন্যা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই বন্যা হয়। আমাদের দেশের নদীগুলোকে ড্রেজিং করতে হবে।

ড্রেজিং কী বাবা?

ড্রেজিং হলো, নদী খনন করা। নদী দিয়ে দীর্ঘদিন পানি প্রবাহিত হয়ে তলদেশ ভরে ওঠে। এতে পানির ধারণক্ষমতা কমে যায়। তাই ড্রেজিং করতে হয়। সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে।

আমাদের কারণেই নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

কীভাবে বাবা?

এই যে, আমাদের মাঝে কিছু মানুষ নদীতে নানা প্রকার বর্জ্য ফেলে নদী ভরাট করে। এতে নদী সরু হয়ে যায়। ঠিকমতো পানি ধারণ করতে পারে না। নদী নাব্যতা হারায়। বেশি বৃষ্টি হলেই আমরা প্লাবিত হই।

নাব্যতা কী বাবা?

নাব্যতা হলো, নদীর স্বাভাবিক অবস্থা। নদীতে বর্জ্য পড়ে, পাড় ভরাট হয়ে নদীর স্বাভাবিক নাব্যতা

হারায়। তাছাড়া অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ। যেমন: শহররক্ষা বাঁধ, জমিরক্ষা বাঁধ, নদীতে সেতু নির্মাণ, এগুলোও আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু এই বাঁধগুলো যদি অপরিকল্পিত হয় তাহলে হিতে বিপরীত হয়। অপরিকল্পিত বাঁধের কারণেও জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। বন্যা হয়।

জি বাবা, এগুলোও বইয়ে আছে। আমি পড়েছি মনে পড়ছে এখন। তুমি অনেক কিছু জানো বাবা।

জানি বলেই তো এখনও নিরাপদ আছি মা। আমাদেরকে জানতে হবে এবং মানতে হবে। তাহলেই আমরা নিরাপদে থাকব।

বাবার কথা শুনে ইরা সাহস পেলো। দাঁড়িয়ে বন্যার পানি দেখছে। কতকিছু ভেসে যাচ্ছে পানির স্রোতে। কত গাছ...। কত ডালপালা...। ফুটবলের মতো গোল-গোল চাকবাঁধা পিঁপড়া। কালো পিঁপড়া। লাল পিঁপড়া। ছোটো পিঁপড়া। বড়ো পিঁপড়া। পিঁপড়াগুলো চাকবাঁধা। একত্রে অনেক পিঁপড়া জড়ো হয়ে গোল-গোল চাক। পিঁপড়ার চাকগুলো দেখে ইরার মনে প্রশ্ন জাগলো-

বাবার কাছে প্রশ্ন রাখল-

পিঁপড়াগুলো চাকবাঁধা কেন বাবা? পিঁপড়া তো খুব ছোটো। এরা এভাবে একত্র হলো কী করে? এগুলো কি মরা পিঁপড়া?

না মামণি। এগুলো মরা পিঁপড়া নয়। পিঁপড়া দলবেধে চলে। মিলেমিশে থাকে। একসাথে কাজ করে। পিঁপড়ার একসাথে চলা দেখেছ?

দেখেছি বাবা। আমাদের বাড়িতেই দেখেছি। এরা কোনো খাবার পেলে একসাথে টেনে গর্তে নিয়ে যায়। একসাথে সারিবদ্ধ হয়ে চলে।

হ্যাঁ, একসাথে কাজ করলে সব কাজই সহজ হয়। একসাথে, একমতে, মিলেমিশে থাকলে অনেক বিপদ-আপদ থেকেও বাঁচা যায়। ফলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। কথায় আছে না?

‘দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ।’



এই পিঁপড়াগুলোর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এরা একত্রে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে চাকবেঁধে আছে। তাই বন্যার পানিতে ডুবেনি। ফুটবলের মতো ভেসে আছে। যেখানে গিয়ে কিনার পাবে, সেখানে আবার একসাথে বসবাস শুরু করবে। এরা মিলেমিশে থাকে বলেই এই ভয়াল বন্যায়ও বেঁচে আছে। বন্যার পানির সাথে লড়াই করে টিকে আছে। এরা মরবে না।

জি বাবা, আমাদের হেডস্যার আর ম্যাডামও আমাদেরকে মিলেমিশে চলতে বলেন। আমরা মিলেমিশে আমাদের স্কুলের পরিচর্যা করি। স্কুলের মাঠ পরিষ্কার করি। শহিদমিনার পরিষ্কার রাখি। সবাই মিলে কাজ করলে সব কাজই দ্রুত করা যায়। পরিশ্রম গায়ে লাগে না।

ঠিক বলেছ মামণি। এখন আমাদের মিলেমিশে কাজ করা খুব প্রয়োজন। সবাইকে মিলেমিশে বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। আশ্রয় দিতে হবে। ত্রাণ দিতে হবে। এসব কাজ একা করা সম্ভব নয়। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। চলো মামণি সন্ধ্যা হতে যাছে। আমরা ঘরে যাই। রাতে সতর্ক থাকতে হবে। বাড়ির চারপাশে খেয়াল রাখতে হবে। আমাকে ভোর থেকেই কাজে নামতে হবে।

কী কাজ বাবা?

ত্রাণ বিতরণ করতে যাব। বানভাসি মানুষ খুব অসহায়। এদেরকে খাবার দিতে হবে। কাপড় দিতে হবে।

আমিও যাব বাবা।

না মা, এসব ছোটোদের কাজ নয়। তুমি তোমার মায়ের পাশে থাকবে। বানভাসি মানুষের জন্য দোয়া করবে।

আচ্ছা বাবা। তুমি সাবধানে থেকো। আমি ছোটো মানুষ। কারো জন্য কিছু করতে পারব না ঠিক। তবে কিছু লিখতে পারব। আমি বন্যা নিয়ে একটি ছড়া লিখেছি। ছড়াটি পত্রিকায় পাঠাবো।

কি ছড়া লিখেছ বাবাকে শুনাবে না?

হ্যাঁ বাবা, শুনাবো। চলো ঘরে যাই।

চলো।

ইরা ঘরে এসে বন্যা নিয়ে তার লেখা ছড়াটি বাবাকে শোনালো। ছড়াটি হলো-

এগিয়ে আসো দেশবাসী
খুব নাজেহাল বানভাসি।
বানভাসিদের পাশে দাঁড়াও- করছি আহ্বান
বানের পানি নিচ্ছে কেড়ে ঘরবাড়ি ও প্রাণ!
আরো বেশি গাছ লাগাও
দেশের প্রেমে মন জাগাও
বন্যা, খরা, ভুমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ
দেশের মানুষ সজাগ হলে হ্রাস পাবে দুর্ভোগ।
গাছের ছায়া গাছের মায়া
জুড়ায় হৃদয় জুড়ায় কায়া
নদী ভরাট, পাহাড় কাটা আর কখনো নয়
গাছের ছায়া গাছের মায়া বাঁচাবে নিশ্চয়।

ইরার লেখা ছড়া শুনে বাবা খুব খুশি হলেন। উৎসাহ দিয়ে বললেন, তুমি তো বানভাসি মানুষের জন্য আমার চেয়েও বড়ো কাজ করেছ মা। তোমার ছড়াটি অসাধারণ হয়েছে। এটা পত্রিকায় পাঠালে অবশ্যই ছাপবে। বহু পাঠক তোমার ছড়াটি পড়বে। মানুষের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। দেশের মানুষ বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ছড়াটির নিচে তোমার পুরো নাম, শ্রেণি, রোল ও স্কুলের নাম লিখে পাঠাবে। ছোটো শিক্ষার্থীদের লেখাকে সম্পাদকরা বেশি প্রাধান্য দেন। আরো লিখে যাও মা। তোমার এই কাজটি মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, দেশ ও পৃথিবীর জন্য উত্তম একটি কাজ। ❑

ফার্মাসিস্ট ও লেখক

বিশ্ব পরিবেশ দিবস



আইউব সৈয়দ

প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'। পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭২ সালে দিবসটি ঘোষণা করে। বর্তমানে এটি বিশ্বের বৃহত্তম পরিবেশভিত্তিক সচেতনতামূলক আয়োজন হিসেবে পরিচিত।

এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'প্রকৃতির অনুপ্রেরণায়, জলবায়ুর সুরক্ষায়, গড়ব ভবিষ্যৎ'। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলনে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয় বৈশ্বিক উদ্যোগের ভিত্তি তৈরি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ৫ই জুনকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৭৩ সাল থেকে দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে দিবসটি উদযাপিত হয়।

জলবায়ু ও পরিবেশের সংকট মোকাবিলা কোনো একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারি-বেসরকারি খাত, গবেষক, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনসচেতনতার মাধ্যমে একটি সবুজ, নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আগামী ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, সারা দেশে ২০ হাজার

কিলোমিটার খাল খনন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, সবুজ শিল্পায়ন, পরিবেশবান্ধব নগরায়ণ এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির অধীনে ২০২৬ সালের আয়োজক দেশ হলো আজারবাইজান। মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী বাকুতে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়গুলো এবারের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাছে, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ও দাবানলের ঘটনা বাড়ছে। বায়ু ও পানি দূষণের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বৃদ্ধি পাছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে চলে যাছে। পরিবেশের এই বিপর্যয় শুধু প্রকৃতির নয়। এটি মানুষের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্যও হুমকি। অন্য দিকে অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, শিল্প কারখানায় ধোঁয়া ও কার্বন নিঃসরণ, নির্বিচারে বন উজাড়, প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নদী ও জলাশয় দখল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার। এসব কারণে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা দ্রুত বাড়ছে। আমরা সবাই জানি প্রকৃতি নিজেই পরিবেশ রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। গাছপালা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। বনভূমি জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে এবং জীববৈচিত্র্যের নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে কাজ করে। নদী ও জলাভূমি পানি সংরক্ষণ করে। তাছাড়া প্রাকৃতিক চক্র সচলও রাখে। তাই প্রকৃতিকে ধ্বংস নয় বরং সংরক্ষণ করাই আগামী পৃথিবীকে নিরাপদ রাখার একমাত্র পথ।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাছে। নদীভাঙনের কারণে প্রতি বছর বহু মানুষ গৃহহীন হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া শহর এলাকায় বায়ুদূষণ উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। পরিবেশ রক্ষায় প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব পালন করা উচিত। যেমন- বেশি বেশি বৃক্ষরোপণ করা, প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার কমানো, বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধ করা, ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা, গণপরিবহণ ব্যবহারে উৎসাহিত হওয়া, খাল, নদী, জলাশয় পরিষ্কার রাখা, শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ কমাতে সচেতন হওয়া। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, এটি প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। একটি দেশের মোট ভূখণ্ডের ২৫% বনভূমি থাকা দরকার। আমাদের তা নেই, বরং প্রতি বছর বনভূমি কমছে। বনভূমি ও জলাশয় ছাড়া নগর পরিবেশ টেকসই হতে পারে না। ইসলাম পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। অপচয় ও দূষণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। গাছ লাগানোকে সওয়াবের কাজ হিসেবে বর্ণনা যেমন করা হয়েছে তেমনি পানি ব্যবহারে সংযম এবং পরিছন্নতার ওপরেও বেশ গুরুত্বারোপ করেছে। প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্টি ও আমানত- এ বিশ্বাসে মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণে দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয়।

তরুণরাই আগামী পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। তাই পরিবেশ রক্ষায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, পরিছন্নতা অভিযান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তরুণদের স্বেছাসেবী কার্যক্রম এবং পরিবেশ আন্দোলনে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে আরও নিরাপদ করতে সহায়তা করবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ আমাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখায়- পরিবেশ রক্ষা ছাড়া মানবসভ্যতা টিকে থাকা সম্ভব নয়। প্রকৃতি বাঁচলে মানুষ বাঁচবে, পৃথিবী বাঁচবে। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সবাইকে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এসে প্রকৃতির অনুপ্রেরণায় সবুজ, নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গঠনে হাতে হাত ধরে কাজ করতে হবে। সুতরাং মনে রাখতে হবে পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হয়ে আগামীর পৃথিবীকে সুন্দর ও নিরাপদ করব আমরাই। ❑

লেখক ও প্রকাশক



তৃষার বুদ্ধি

মো. নজরুল হাসান ছোটন

স্কুল ছুটি হবার পর তৃষা হাতে একটি ফুলের চারা নিয়ে বাড়িতে আসে। তৃষার হাতে ফুলের চারা দেখে মা রাগ হয়ে যান। বলেন, তোদের বাপ-মেয়ের কাণ্ড দেখে আর বাঁচি না। কেবল গাছ লাগাও আর গাছ লাগাও! সারা বাড়ি গাছ লাগিয়ে একেবারে জঙ্গল বানিয়ে ফেলছিস !

মায়ের কথায় তৃষা ভয় পেয়ে যায়। বলে, আমি কি চারাটাকে কিনে এনেছি নাকি? স্কুল থেকে প্রত্যেক ছাত্রীকে একটি করে ফুলের চারা উপহার দেওয়া হয়েছে। ম্যাডাম বলেছেন, তোমরা গাছের যত্ন নিবে। তবুও মা আর গাছ লাগাতে পারবি না বলে নিজের কাজে চলে যান। তৃষা তখন ভাবে, কীভাবে মাকে শান্ত করে ফুলের চারাটি লাগানো যায়।

তৃষা বই, খাতা, ব্যাগ নিজের রুমে রাখতে গিয়ে দেখে পাশের রুমে ছোটো মামা বসে আছেন। মামাকে দেখে তৃষা খুব খুশি হয়। বলে, ছোটো মামা তুমি কখন এসেছ?

এই তো ঘণ্টা দুয়েক হবে।

ছোটো মামাকে দেখে তৃষা একটি বুদ্ধি বের করে। সে জানে, মা ছোটো মামাকে খুব আদর করেন। তার কথা সে কখনো ফেলতে পারে না। মামা যা বলে, মা তা মেনে নেন। তাই তৃষা মামাকে বলে, ছোটো মামা, তুমি আমার একটি উপকার করে দিবে?

কী উপকার করতে হবে শুনি?

আমাদের স্কুল থেকে প্রত্যেক ছাত্রীকে একটি করে ফুলের চারা উপহার দিয়েছে। আমি চারাটি বাড়িতে নিয়ে এসেছি। কিন্তু মা লাগাতে দিচ্ছেন না।

কেন লাগাতে দিচ্ছে না? গাছ লাগানো তো ভালো। যত গাছ লাগাবে তত পরিবেশ ভালো হবে। বায়ু দূষণ থেকে বাঁচা যাবে এবং দূষণমুক্ত বায়ু পাওয়া যাবে।

মাকে সে কথাটিই বোঝাও। আমি আর বাবা বেশি বেশি গাছ লাগাই বলে মা আমাদের দুজনের ওপর রাগ করে আছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপাকে কথাটি বুঝিয়ে বলব।

দুপুরে ছোটো মামা, তৃষা আর তার মা একত্রে খেতে বসে।

ছোটো মামা তৃষার মাকে বলে, আপা, তৃষা স্কুল থেকে একটি ফুলের চারা এনেছে। তুমি ওটাকে লাগাতে দিচ্ছ না কেন?

আর কত গাছ লাগাবে? গাছ লাগাতে লাগাতে বাড়িটা একেবারে জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে।

না আপা, গাছ লাগালেই বাড়ি জঙ্গল হয়ে যায় না। বরং গাছের হাওয়ায় পরিবেশ ভালো থাকে, স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

তা তো জানি। তবুও দেখতে হবে না। আমাদের বাড়িটা তো তেমন বড়ো না। বেশি গাছ লাগালে কেমন জঙ্গল হয়ে যাবে না?

না আপা, তোমরা যদি দু'বেলা ঠিকমতো গাছের গোড়ায় পানি দাও, গাছের আগাছা, ডালপালা ছেঁটে পরিষ্কার করে দাও। তাহলে দেখবে তোমাদের বাড়িটি জঙ্গল বাড়ি না হয়ে একেবারে আধুনিক বাগান বাড়ি হয়ে গেছে।

তৃষার মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তোর কথা কি ফেলতে পারি? কিন্তু আমাকে বোঝানোর জন্য বুদ্ধিটা নিশ্চয়ই তোর ভাগনি দিয়েছে।

তৃষা তখন খিলখিল করে হেসে ওঠে। মামাকে বলে, ছোটো মামা, তুমি আমার বড়ো উপকার করে দিলে। তোমাকে ধন্যবাদ!

এটা উপকারের কী হলো? এটা তো সবার জানার কথা যে, গাছ লাগানো ভালো। কথায় বলে না 'গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও।'

তৃষার মা একটু হেসে বলেন, ঠিক আছে। তাহলে দেখছি আমাকেও গাছ লাগাতে হবে, গাছের যত্ন নিতে হবে।

ছোটো মামা বলে, আপা আমি শুনলাম দুলাভাই তোমাদের বিল্ডিংটি চারতলা করতে চাছে।

তৃষা বলে, কেন ছোটো মামা?

তোমাকে আর আপাকে সেই কথাই বলছি। গত বছর আমাদের এলাকার ফয়েজউদ্দীনের চারতলা ভবনটি কালবৈশাখি ঝড়ে কেঁপে উঠেছিল। ভবনের বাসিন্দারা সবাই ভয়ে রুম থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। এটা হয়েছিল ফয়েজউদ্দীনের দোষে। কারণ, তার বাড়িতে কোনো গাছপালা ছিল না। সে শুধু ঘর বানাতো। কিন্তু গাছের যে প্রয়োজন আছে তা বুঝতে পারেনি। যদি বাড়িতে উঁচু গাছপালা থাকে তাহলে ঝড়ের বেগটা গাছের সঙ্গেই আঘাত হানে। বাড়িঘরে তেমন আঘাত হানতে পারে না। বাড়িঘর ভালোই থাকে। ফয়েজউদ্দীন এই ঝড়ের পর থেকে গাছ লাগানোর প্রয়োজনটা বুঝতে পারে। এখন তো তার বাড়িতে অনেক গাছপালা লাগাচ্ছে। তাই আপা তোমাকে বলছি, তোমাদের চারতলা ভবনকে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বেশি করে গাছ লাগানো দরকার।

আচ্ছা, আমি তো তোদের কথা মেনেই নিলাম।

এমন সময় তৃষার বাবা অফিস থেকে ফিরে আসেন। তৃষা হাসি হাসি মুখে বাবার কাছে গিয়ে বলে, বাবা তোমাকে একটি সুসংবাদ দিছি।

কী সুসংবাদ?

মা আর আমাদের গাছ লাগাতে বাধা দিবে না। মা বুঝতে পেরেছেন যে, গাছ লাগানো কত ভালো।

তাই নাকি!

হ্যাঁ বাবা। কিন্তু সবকিছুই হয়েছে ছোটো মামার জন্য। ছোটো মামাই মাকে বুঝিয়ে রাজি করেছে যে, গাছ লাগানো ভালো।

ছোটো মামা তখন হাসতে হাসতে বলে, কিন্তু আমি তো মনে করি তোমার বুদ্ধিটাই বেশি কাজ করেছে। কারণ তুমিই তো আমাকে বুদ্ধি করে আপাকে বোঝাতে বলেছিলে।

তখন তৃষা, ছোটো মামা, তৃষার বাবা-মা একত্রে হেসে ওঠেন। ❑

শিশুসাহিত্যিক

সবুজের শপথ

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

বিশ্ব পরিবেশ দিবস
জুনের পাঁচ তারিখ,
তার চেতনায় সবাই মেতে
গাছ লাগাই চারিদিক।

সবুজ পাতা হাসবে গাছে
পাখি বসে গাইবে গান,
স্নিগ্ধ হাওয়া দিয়ে আবার
আনবে প্রাণে সুখের তান।

বন্যা খরা ঝড় বিপদে
গাছেরা দেয় স্নেহের ছায়,
ফুলে-ফলে ভরে উঠবে
আমাদের এই আপন গাঁয়।

গাছ লাগালে নির্মল হবে
মাঠঘাট আর নীলাকাশ,
সবুজ রেখে পরিবেশকে
সুস্থ থাকব বারো মাস।

বাংলার রূপ

মাহমুদুল হাসান

সবুজ ধানের ক্ষেতে
হাওয়ার দোলা লাগে
বাংলার রূপ দেখে
মনে নাচন জাগে।

তালগাছ মাথা তুলে
দেখে দূরের আকাশ
সকালের শিশির
যেন মুক্তোর আভাস।

বাঁশির সুরে রাখাল ছেলে
ডাকে গরুর পাল
গ্রামবাংলা হাসে যেন
সোনালি সকাল।

বৃক্ষরোপণ

কাজী জাবির আহমেদ

একটি গাছ একটি প্রাণ
সবার জানা কথা
গাছের ছায়ায় দূর হয়
ক্লান্তি আর অবসাদের ব্যথা।

গাছ দেয় অক্সিজেন
দেয় শীতল হাওয়া
গাছ ছাড়া পৃথিবী
শূন্যে হারিয়ে যাওয়া।

ফাঁকা জমি পড়ে আছে
প্রতি গ্রামে গ্রামে
চারাগাছ রোপণ করি
প্রিয়জনদের নামে।

অষ্টম শ্রেণি, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম



বর্ষার সাজ

বেণীমাধব সরকার

চারিদিকে ঝরঝর বর্ষার ধারা
নব কিশলয়ে বনে পড়ে যায় সাড়া।
কদম জুঁই কেয়া ফোটে অফুরান,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছোটে বকুলের ঘ্রাণ।
ময়ূর পাখা মেলে নাচে উল্লাসে
বনরানি দেখে যেন আনন্দে হাসে।
মেঘপরি যায় উড়ে আকাশের পথে
সূর্য পালায় যেন আসমান হতে।
আঁধারে ঢেকে যায় সকাল-দুপুর
বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে টাপুরটুপুর।
বর্ষার জলে নদী টইটম্বুর
মাঝিরা গায় গান সুর সুমধুর।
মেঝে মেলে কৃষাণিরা নকশির কাঁথা
সুঁই সুতা দিয়ে লিখে রঙিন গাথা।

আম-কাঁঠালের ছুটি

ইউনুস আহমেদ

আয়রে সবাই দুষ্টু ছেলের দল
আজ আমাদের আম-কাঁঠালের ছুটি
বনবাদাড়ে ছুটব আজি চল
আনন্দ সব কুড়িয়ে নেবো করব লুটোপুটি।
আয়রে ছুটে দস্যি ছেলের দল
ছুটব আজি সবাই মিলে আলোক নদীর পাড়ে
বুকে আছে সাহস এবং বল
দেখব হেথায় ফড়িং মেলা কাশের বনের ধারে।
আয়রে ছুটে দুরন্তদের দল
চড়ুইভাতির মেলায় আজ বিপুল আয়োজন
আসছে ধেয়ে বৃষ্টি ধোঁয়া জল
পাতার নৌকা ভাসিয়ে দেবো আমরা কয়েকজন।

নদী

মো. জাকির হোসেন

নদী তুমি বয়ে চলো নিরবধি
এত চলার ছন্দ কোথায় পেলে
বলতে আমায় যদি।
কোথায় বাড়ি কোথায় তোমার ঘর
উৎস তোমার কই?
তোমায় দেখে অবাক চোখে
শুধুই চেয়ে রই।

তোমার জীবন আমার জীবন
একই গতি, একই ধারা
দুটোই পাগলপারা
অনন্ত এই ছুটে চলা, কথাবলা
হয়ে দিশে হারা।

তোমার ভালোবাসায় বাংলাদেশ
বিশ্ব পরিচিতি
নেইকো তোমার শেষ
নদীমাতৃক বাংলাদেশ।

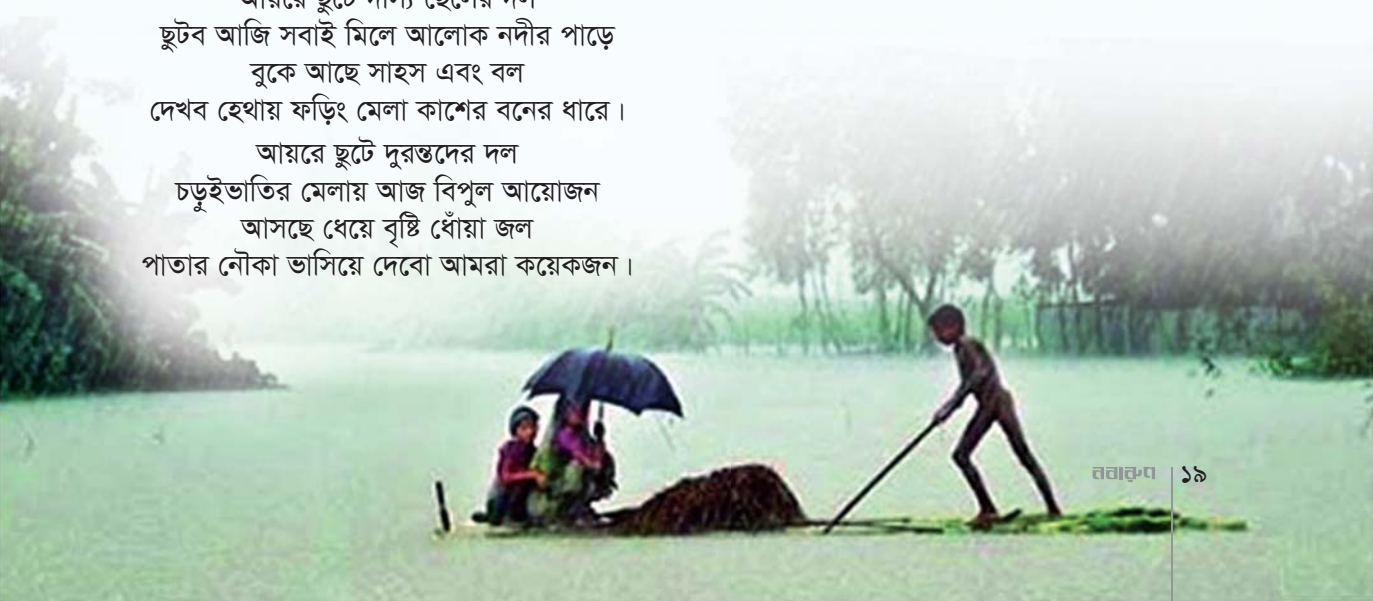



বাবা দিবসের কথা

ইব্রাহীম রাজু

বাবা শুধু একটি সম্পর্কের নাম নয়, তিনি সন্তানের জীবনের প্রথম ভরসা, নিরাপত্তা এবং সাহসের প্রতীক। নীরবে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কারিগর। তিনি শুধু পরিবারের উপার্জনকারী নন বরং একজন অভিভাবক, বন্ধু, শিক্ষক ও অনুপ্রেরণার উৎস। বাবার এই অসীম ত্যাগ, ভালোবাসা ও দায়িত্বকে সম্মান জানাতেই প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব বাবা দিবস। দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বাবার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সময়ের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য নয়।

বিশ্ব বাবা দিবসের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের স্পোকেন শহরের সোনোরা স্মার্ট ডড নামের এক নারী প্রথম বাবা দিবস পালনের উদ্যোগ নেন। তাঁর বাবা একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি একাই ছয় সন্তানের লালন-পালন করেছিলেন। বাবার এই অসাধারণ ত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে সোনোরা একটি বিশেষ দিন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম বাবা দিবস পালিত হয় ১৯শে জুন, ১৯১০ সালে। পরে ধীরে ধীরে এটি যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে অনেক দেশে জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্ব বাবা দিবস পালন করা হয়। যদিও কিছু দেশে ভিন্ন তারিখেও এই দিবস উদযাপিত হয়।

বাবা দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার একটি উপলক্ষ্যও। ব্যস্ত জীবনে আমরা অনেক সময় বাবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাই। এই দিনটি সেই সুযোগ এনে দেয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা আয়োজনের মাধ্যমে বাবা দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন সন্তানরা বাবাকে শুভেচ্ছা জানায়, ফুল, কার্ড বা ছোটো উপহার দেয়। কেউ বাবার সঙ্গে সময় কাটায়, একসঙ্গে খাবার

খায় বা কোথাও ঘুরতে যায়। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকেই বাবার সঙ্গে ছবি ও স্মৃতিচারণ করে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। তবে সবচেয়ে বড়ো উপহার হলো বাবার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও যত্ন।

বাবা দিবসে শুধু উপহার দেওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই সবচেয়ে বড়ো উপহার। সাহিত্য মানুষের অনুভূতিকে জীবন্ত করে তোলে তাই ছড়া ও কবিতা বাবা দিবসের আবেগকে আরো অর্থবহ করে তুলতে পারে। বাবা দিবস উপলক্ষ্যে লেখা ছোটো ছোটো ছড়াগুলো শিশুদের মনে বাবার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলে। যেমন-

বাবা আমার শক্তি সাহস
ভালোবাসার ধন
বাবার ছায়ায় জীবন আমার
সুখে ভরা প্রতিক্ষণ।

একজন বাবা সন্তানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে পরিবারের সুখ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। সন্তান যেন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে সে জন্য নানা ত্যাগ স্বীকার করেন। বাবা দিবস আমাদের সেই অবদান স্মরণ করতে শেখায়।

তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপদেশ আমাদের সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। অনেক সময় বাবা নিজের কষ্ট লুকিয়ে রেখে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন। বাবাকে ভালোবাসা যেন শুধু একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। বছরের প্রতিটি দিনই তাঁর প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

বাবার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের ভালোবাসা ও যত্ন আরও বেশি প্রয়োজন হয়। তাই তাঁর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

তাই শুধু বাবা দিবসেই নয়, বছরের প্রতিটি দিন বাবার প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। একজন সুখী বাবা মানেই একটি সুখী পরিবার, আর একটি সুখী পরিবারই একটি সুন্দর সমাজ ও সমৃদ্ধ দেশের ভিত্তি। বিশ্ব বাবা দিবস আমাদের সেই চিরন্তন সত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ❑

প্রাবন্ধিক





প্রিয় বাবা,

রাত নিঝুম আকাশটা বড্ড ক্লান্ত,তারাগুলো আহ্লাদে মিটিমিটি হাসছে, খোলা জানালা দিয়ে আসছে হাসনাহেনা ফুলের সৌরভ। খাতা-কলম হাতে নিয়ে ভাবছি তোমায় কিছু লিখব। পত্রের শুরুতে আমার ভালোবাসা নিও, আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। তুমিও হয়ত সবাইকে নিয়ে ভালো আছো, আমি জানি হাজার কষ্টের ভিড়ে তোমার মুখে সর্বদা হাসি থাকে। হাজার বিষাদের ভিড়ে কীভাবে জীবনটাকে রঙিন করে সাজাতে হয় তোমার থেকেই শেখা। বাবা, মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়, কষ্টগুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরে টপটপ করে মুছে দেয় নয়নের কাজল।

কিসের ব্যথা বাসা বেঁধে আছে হৃদয় কোণে? নিত্যদিন তারা হৃদয়ের বেলকুনিতে আন্দোলন করে প্রশ্ন করে আমায়, কে দাঁড়াবে তোমার বাবার পাশে ? তোমার বাবার তো ছেলে নেই? তোমাকেই তো ছেলে হিসেবে দেখতে চায় তোমার বাবা। তারা আরো প্রশ্ন করে, কিসের জন্য লেখাপড়া করেছো? যদি বাবার পাশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দাঁড়াতে না পারো? আমি একটা দীর্ঘশ্বাসে এসব প্রশ্নের উত্তর চাপা দিয়ে রাখি।

তখন আমার খুব মনে পড়ে সে দিনের কথা, আমি এসএসসি পরীক্ষায় যখন এ প্লাস পেয়েছিলাম, তখন তুমি কতই না খুশি হয়েছিলে। আজ যদি আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার পাশে দাঁড়াতে পারতাম তাহলে তোমার হৃদয়ে নামতো সুখের জোয়ার। সবাইকে বুক ফুলিয়ে বলতে পারতে ছেলে নেই তো কি হয়েছে। কিন্তু আমি পারিনি তোমার হৃদয়ের সুখের জোয়ার নামাতে। এক হাতে আলো, অন্য হাতে স্বপ্নেরা পুড়ে হয় ছাই। আমি তো স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোমার আকাশ ভরিয়ে দেবো তারায় তারায়। সাঁঝের পাখি হয়ে ফিরব তোমার সুখের আকাশে। এখন আমি উঁকি দিয়ে দেখি স্বপ্নেরা আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে বহুদূর। বাবা, তুমি ভালো থেকো, শরীরের যত্ন নিও। তোমার মেয়ে দূরে থাকলেও তোমার পাশে সবসময় আছে, থাকবে। তোমাকে খুব ভালোবাসি কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারি না। তুমি চিন্তা করো না আমি খুব ভালো আছি। মুয়াজ্জিনের মধুর আযান ভেসে আসছে,পাখিদের কলরব শুনতে পাচ্ছি, ভোর হয়ে গেছে নামাজ পড়ব, আমি প্রতি নামাজে আল্লাহকে বলি, হে আল্লাহ আপনি আমার বাবাকে সবসময় সুস্থ রাখুন, ভালো রাখুন।

ইতি
তোমার বড়ো মেয়ে
শারমিন নাহার ঝর্ণা

কবিতায় বাবা

বাবার স্নেহ

মো. ইকবাল করিম

বাবার স্নেহ বটগাছের ছায়া
আগলে রাখে মমতা আর মায়া।

বাবার চোখে সন্তানের স্বপ্নের আলো
সন্তানের সুখেই বাবা থাকেন ভালো।

ঝড়-বাদলে দাঁড়িয়ে হয় দেয়াল
সন্তানের পথচলায় রাখেন খেয়াল।

বাবা মানে নিরাপদ এক আশ্রয়
তাঁর ছোঁয়ায় মুছে যায় সব ভয়।

শাসনের আড়ালে থাকে ভালোবাসা
সন্তানের সাফল্যে জাগে আশা।

বাবা হতে পারে

আতিক রহমান

বাবা বটবৃক্ষের ছায়া
বাবা মধু মৌ মৌ মায়া
বাবা মাথার ওপরে ছাতা
বাবা মহৎ মহান দাতা।

বাবা হতে পারে আরো কী কী?
বাবার পিঠ রেলগাড়ি ঝিকিমিকি!
বাবার দু'হাত দোলনাও হতে পারে
ঘুম পাড়ানি গানে ঘুম পারাতেও পারে।

ছেলের চোখেই বাবার স্বপ্ন বোনা-
বাবা হতে পারে স্বপ্নের ম্যারাডোনা
বাবা হতে পারে ক্রিকেটের ইমরান
বাবা গায় যেন আসিফের মতো গান!

ছেলের চোখে বাবা মস্ত বীর
শুধু ম্যারাডোনা, ইমরান খান নয়
হতে পারে তিতুমীর!



বাবার হাত ধরে

মো. মিজানুর রহমান

ছোট্ট দুটি পা ছিল
কাঁপা কাঁপা ভীষণ
হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতাম
আমি যখন-তখন।

সেই সময় বাবা
হাত বাড়িয়ে এল
ভয়ের মেঘ সরিয়ে
সাহস জাগিয়ে দিল।

বাবার হাত ধরেই
প্রথম হাঁটা শিখি
বাবার কাঁধেই আমি
প্রথম পৃথিবী দেখি।

এক পা, দুই পা
এগিয়ে যেতাম ধীরে
বাবার মুখে হাসি ফুটত
আমার হাঁটা ঘিরে।

ত্যাগী বাবা

নজরুল ইসলাম বাদল

কত ত্যাগ, কত শ্রম সন্তানের তরে
নিজের সুখ বিলিয়ে দেন অকাতরে।
বাবা মানে আকাশছোঁয়া আশীর্বাদ
বাবার পরশে ভেঙে যায় সকল বাধ।

শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা থাকুক তাঁর প্রতি
বাবার ঋণ শোধ করা নয়তো সহজ অতি।
বাবা আছেন বলেই পৃথিবী এত আপন
বাবাই সন্তানের জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বাবার অবদান
তাঁর ত্যাগে রচিত হয় সন্তানের সম্মান
বাবা আমার জীবনের অনন্ত প্রেরণা
তাঁর ভালোবাসায় হয় চিরদিনের ঠিকানা।

বাবা

আহসানুল হক

বাবার শাসন হয়ত কঠিন
মেজাজ বাবার কড়া
ভেতর ভেতর বাবা নরম
মোম দিয়ে মন গড়া !

আঁধার যদি হঠাৎ নামে
বিপদ যদি আসে
বীরের বেশে বাবাই কেবল
দাঁড়ান এসে পাশে !

বাবা পরেন পুরান জামা
বাবার জুতো ছেঁড়া
সন্তানকে যে চান বানাতে
সবার চেয়ে সেরা !

ছেলে-মেয়ে করতে মানুষ
ঝরান বাবা ঘাম
কিন্তু আমরা ক'জন পারি
দিতে বাবার দাম ?

এই বাবারা বুড়ো হলে
যাই তাঁদেরকে ভুলে
আশীর্বাদে রাখেন বাবা
তবু হৃদয় খুলে !





আমার বাবা

নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল

বাবা মানে
দায়িত্বের দৃঢ় প্রতীক
সন্তানের ভবিষ্যৎ
গড়েন অবিচল ঠিক।

কঠোর কথার আড়ালেও
থাকে স্নেহ ভরা মন
ভালোবাসার বাঁধনে
গড়েন আপন ভুবন।

বই হাতে স্কুলে
নিয়ে যান আমায়
সত্য আর ন্যায়ের
শিক্ষা দিয়েছেন সদায়।

বাবা মানে

খলিলুর রহমান বাবু

ভদ্রতা, সততা আর
মানবতার বাণী
বাবার মুখে শুনেছি
জীবনের গল্পখানি।

অসুখ-বিসুখে পাশে
থাকেন নির্ভরতায়
সন্তানের কষ্টে তাঁর
চোখ ভিজে যায়।

বাবার মতো আপন
মানুষ পাওয়া বড়ো দায়
তাঁর আশীর্বাদে
জীবন সহজ হয়ে যায়।



জীবিত ভূতনাগিনী

নাসীমুল বারী

-এই নে, ঘরে হাতে বানানো স্যান্ডউইচ। তোর জন্য এনেছি। খেয়ে নে, তারপর রাইডে বেরুব।

রাইয়ানের সামনে স্যান্ডউইচটা এগিয়ে দিয়ে সায়মন বলে কথাগুলো। রাইয়ান সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখেই বলে- আচ্ছা, আমরা দোকান থেকে যে স্যান্ডউইচ কিনে খাই, ওগুলো কি পায়ে বানায়? মাঠে বানায়?

চমকে সায়মন জিজ্ঞেস করে, মানে?

-না, এই যে তুই বললি 'ঘরে হাতে বানানো'। তাই মনে করেছি কনফেকশনারির ওরা পায়ে বানায়, মাঠে বানায়। তোদেরটা হাতে বানিয়েছিস বলে আলাদা কিছু!

হো হো করে হেসে দেয় সায়মন। হাসতে হাসতে বলে, তুই সব সময় কথায় প্যাঁচ ধরিস। আরে কেউই পায়ে বানায় না, মাঠেও বানায় না।

-তাহলে তুই যে বললি ঘরে আর হাতে বানানো তোর স্যান্ডউইচের বৈশিষ্ট্য!

-ধ্যাত, শুধু প্যাঁচ! এসব তো একটা কথা মাত্র। বিক্রির জন্য নয়; নিজেরা খাওয়ার জন্য বানায় বলেই বলা হয় 'হাতে বানানো, ঘরে বানানো' ইত্যাদি এসব কথা। বুঝলি? খেতে খেতে চল এখন।

-হুম, মাস্টারমশাইয়ের মতো যখন বললি বুঝতেই তো হবে আমাকে। আচ্ছা দে, খাই।

পরাগ, কাফি, ওমর, তানভীর- পাড়ার বন্ধু ওরা সবাই। পড়ায় একেক জন একেক শ্রেণির। ক্লাস সেভেনেরও যেমন আছে, আবার কলেজেরও আছে। ছোটো-বড়ো যা-ই হোক; পাড়ার বন্ধুত্বের বন্ধনটা বেশ চমৎকার।

ওরা সাইকেল চালায়, সাঁতার কাটে, ফুটবল খেলে, ক্রিকেট খেলে। আবার চাঁদা তুলে নানারকম অনুষ্ঠানও করে পাড়ায়।

মাঠে আসে সায়মন, রাইয়ান। এখান থেকে সবাই মিলে রাইডে বেরুবে। সায়মন এসেই সাইকেল দিয়ে একটা ধাক্কা দেয় তানভীরের সাইকেলে। তানভীর পড়ে যায় পরাগের উপর। দুজনেই পড়ে যায়। সাথে সাথে সায়মন বলে, দুঃখিত, ব্রেক ফেইল।

উঠতে উঠতে তানভীর বলে, ব্রেক ফেইল না দুষ্টুমি।

-কী বলতে চাস তুই? একটু মুড নিয়ে সায়মন বলে।

সাথে সাথে তানভীর বলে, তোর আর দুষ্টুমি করতে হবে না। এখন প্ল্যানটা কর কই যাব আমরা?

সায়মন শান্ত কণ্ঠে বলে, জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে। সামনে বিজয় দিবস, কুচকাওয়াজের জন্য রেডি করতেছে। দেখে আসি চল।

অমনি ওমর বলে, এজন্য কি আজ কয়দিন ফাইটার উড়ছে?

-হ্যাঁ রে, পেপারে দেখলাম বিমানবাহিনীরও শো থাকবে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর উদযাপনে ৫৪ জন প্যারাট্রুপার জাতীয় পতাকা হাতে স্কাইড্রাইভিং করবে। এটি হবে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্কাইড্রাইভিং।

-কিন্তু আমরা এখন গেলে কি দেখতে পাবো?

পরাগের ওই কথায় রাইয়ান বলে, না রে! ওসব তো শুধু বিজয় দিবসের দিন দেখানো হবে।

সায়মন একটু চড়া গলায় বলে, আরে ধ্যাৎ! এখন এসব দেখাবে নাকি? আমরা তো যাচ্ছি সাইকেল রাইডিংয়ে। রাইডিংয়ের একটা টার্গেট ঠিক করেছি প্যারেড গ্রাউন্ডে। টার্গেট বা লক্ষ্য ঠিক না করে কি কোনো কিছু করা যায়?

-বাহ, তুই দেখি মাস্টারমশাইয়ের মতো নীতিকথা শোনাচ্ছিস!

-শোন, এটা শুধু মাস্টারমশাইয়ের কথা না; সবার জীবনেরই কথা। কোনো লক্ষ্য ঠিক না করলে কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারে না। এই যে আমরা এখন স্কুল-কলেজে পড়ি; আমাদের সবারই একটা লক্ষ্য আছে-কে কী হবো।

-থাম, এত জ্ঞান দিতে হবে না।

রাইয়ানের এমন ঝাড়িতে আর কোনো কথা বলে না সায়মন। ঠিক তখনই আচমকা এসে হার্ডব্রেক কষে থামে বুলবুল। ওকে দেখে সবাই চমকে যায়। সায়মন জিজ্ঞেস করে, কীরে, হাজার বছর পর কোত্থেকে এলি?

-এই বোকারা হাজার বছর না, দুই মাস।

-ওই হলো একই কথা!

-মেঘের ওপরে নীলগিরি গ্রহ থেকে, বাবার সাথে ছিলাম ওখানে।

সায়মন সাথে সাথে বলে, গ্রহ না ছাই! গ্রহ কাকে বলে জানিস? গ্রহের সংজ্ঞা শিখে আয়।

-আমাকে জানতে হবে না। এখন তোরা কোথায় যাবি সেটা বল?

-জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে।

-এত বিজি রাস্তায়? ওখানে কি ইজিলি যেতে পারব?

ওমর বলে, তাহলে কোথায় যাব ভাইয়া?

বুলবুল ওদের সবার উদ্দেশ্যে বলে, চল ভূতনাগিনী দেখে আসি। একদম জীবিত।

- ভূত না-গি-নী...! তাও জীবিত!

সবার চোখ ছানাবড়া! কী বলছে বুলবুল! পরাগ বলে, মজা করছ না তো ভাইয়া?

-আরে মজা করব কেন? একদম জীবিত ভূতনাগিনী। খ্রিষ্টান সমাধি ক্ষেত্রের কাছে আছে ওটা।

আরো ভড়কে গিয়ে পরাগ বলে, কী বললা ভাইয়া! সমাধির কাছে থাকে ওটা!

বুলবুল একটু রহস্যের হাসি হেসে আবার বলে, শোন, ওটা কিন্তু তরল খাবার খায়!

পরাগ, ওমর ওরা ছোটো। ওরা তো ভীষণ ভড়কে গেছে। ভড়কে গেছে অন্যরাও। সাহস করে পরাগ আবার বলে, সমাধিক্ষেত্রের কাছে থাকে, তরল খাবার খায়। তরল মানেই তো...! ভাইয়া এটা কি সত্যি সত্যিই ভূতনাগিনী? বিকেলে যাব আমরা?

সায়মন মুড নিয়ে বলে, দেখ মজা করিস না। বল্ ঘটনাটা কী?

-মজা করলাম কই? যেটা ঘটনা সত্য সেটাই বললাম। চল দেখে আসি সত্যিটা।

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল রাইয়ান। এবার সে বুলবুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, জীবিত ভূতনাগিনী; মানেটা কী! ভূত এক জিনিস, নাগিনী আরেক জিনিস!

বুলবুল রায়হানকে বলে, এত ভাবিস কেন? এক জিনিস না দুই জিনিস- গেলেই তো দেখতে পাবি। সত্যিটা দেখতে পাবি। যাবি?

সায়মন বলে, হ্যাঁ যাবো।

সায়মনের কথায় সবাই বলে ওঠে, আমরাও যাব। কই যেন ওটা?

-উয়ারি খ্রিষ্টান সামাধিক্ষেত্রের পাশে বলধা গার্ডেনে।

পরাগ ভীতুকণ্ঠে বলে, বলধা গার্ডেন? ভূত তো গাছে থাকে।

পরাগের মাথায় একটা টুকা দিয়ে সায়মন বলে, এত ভয় পেলে বাসায় গিয়ে ঘুমা। আমরা গেলাম। চল বুলবুল।

শিহরণ আর রোমাঞ্চকর এক অনুভূতি নিয়ে সবাই রওনা দেয় বলধা গার্ডেনের উদ্দেশ্যে। ভয়-আনন্দ, অনুভূতি আর রোমাঞ্চে সবার মনের কল্পনা উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত।

সাইকেল দল এসে থামে বলধা গার্ডেনের গেটে। বলধা গার্ডেন দুই ভাগ- উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ। উত্তর অংশের নাম সিবলী, দক্ষিণ অংশের নাম সাইকী। টিকিট কেটে শুধু উত্তরাংশ সিবলীতে ঢোকা যায়।

টিকিট কেটে ওরা সবাই সিবলী অংশে প্রবেশ করে। বড়ো বড়ো গাছে পুরো বলধা গার্ডেনটাই প্রায় আচ্ছাদিত। গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে পড়ন্ত বিকালের কিছু রোদ এসে পড়ছে। আলো-আঁধারি আর গাছের ছায়া- সব মিলিয়ে এক থমথমে ভাব। গার্ডেনে প্রবেশ করেই পরাগ চারিদিকে একবার তাকিয়ে বলে, ভাইয়া কেমন ভূতুড়ে ভূতুড়ে লাগছে! সত্যি ভূত ধরবে নাকি। আচ্ছা ভাইয়া সামাধিক্ষেত্রটা কোথায়?

বুলবুল হেঁয়ালিভাবে পুবের দেয়ালটা দেখিয়ে বলে, ওটারই পাশে রাস্তা। আর তার পাশেই খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্র।

-সমাধিক্ষেত্রের এত কাছে এমন ভূতুড়ে জায়গায় আমরা! ভাইয়া... আমার ভয় লাগছে।

সবার মাঝে উত্তেজনা ও শিহরণ- এই বুঝি ভূত দেখবে। ভূতনাগিনী- সাপ আর ভূতের মিশেলে কী জিনিস ওটা? কেমন ওটা? ঘাড়-টাড় মটকাবে না তো আবার? নাকি সাপের মতো ছোবল মারবে? নাকি দুটো মিলে ভয়ংকর কিছু একটা।

মাঝারি আকৃতির একটা গাছের পাতা একটু নড়ে উঠে। আলতো চিৎকার দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পরাগ বলে, ওই দেখো দেখো! গাছের পাতাটা নড়ছে। ওখানে....

সবাই দেখছে ওই গাছটা। তারা মৃদু পায়ে হাঁটছেও।

বেশ আগ্রহ, কৌতূহল, ভয় সবার মাঝে। গাছে কিছু আছে কি?

রাইয়ান হেয়ালিভাবে বলে, পাতা কাঁপলেই কি ভূত? এত ভয় থাকলে আসছিস কেন আমাদের সাথে?

আচমকা ওমর চিৎকার দিয়ে ডান দিকের একটা গাছ দেখিয়ে বলে, দেখো দেখো সাপের মতো ওটা কী প্যাঁচিয়ে আছে গাছে?

সায়মন তাকায়। উৎসুক আর গবেষণার দৃষ্টিতে দেখে। তারপর ওমরের পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে



বলে, দেখ ভালো করে, ওটা লতানো একটা গাছ। পুরনো বলে ওর বাকলটা ফাটা ফাটা মনে হচ্ছে। এ লতা গাছ দেখেই সাপ ভাবলি? ভীতু কোথাকার!

পরাগ ভীতু কণ্ঠে কাঁদো কাঁদো স্বরে বুলবুলকে বলে, ভাইয়া... ভাইয়া যদি ওটা ছোবল মারতে আসে?

সাথে সাথে বুলবুল বলে, দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া!

আবার সবাই থমকে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড ভয় আর শিহরণ সবার মাঝে। বুলবুল পরাগের দিকে তাকিয়ে বলে, কী বললি?

সবাই চুপ।

পরাগ আমতা আমতা করতে করতে বলে, যদি ছোবল মারে। আচ্ছা ছোবল মারলে তো সরে যেতে পারব। কিন্তু যদি ঘাড় মটকানোর জন্য চেপে ধরে?

বুলবুল সাথে সাথে হেসে দেয়। হাসি নিয়েই বলে, সমস্যা নেই। আমি সবার থেকে লম্বা। ঘাড় ধরলে আমারটা আগে ধরবে।

আবার এগিয়ে যেতে থাকে।

ভয়, শিহরণ নিয়ে সবাই আস্তে আস্তে হাঁটে। এদিক-ওদিক তাকায়। গাছে গাছে তাকায়। চারিদিকে আলো-আঁধারি। বুলবুল সবাইকে নিয়ে পুব পাশের একটা গাছের সামনে এসে দাঁড়ায়।

-ইউরেকা... ইউরেকা... !

আচমকা চিৎকার দিয়ে উঠে পরাগ। শিউরে ওঠে কেউ কেউ। ওমর গেঞ্জির গলার দিকটা টেনে বুকে থুতু দেয়। ভয় পেলে মানুষ এমনটিই করে। পরাগ হাত তুলে দেখিয়ে বলে, ওই তো ভূতনাগিনী!

প্রচণ্ড ভয়, শিহরণ আর বিস্ময় নিয়ে সবাই তাকায় ওদিক। পাতাগুলো সবুজ আমপাতার মতো এবং ছোটো ছোটো ফুলে সাত-আট ফুটের লম্বা একটি গাছ দেখায়। গাছটার গায়ে বাগান কর্তৃপক্ষের পরিচিতিমূলক নেমপ্লেট 'ভূতনাগিনী'।

ওটা দেখে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ম্যাজিক মামা

সত্যজিৎ বিশ্বাস

ডিং ডং, ডিং ডং।

কলিংবেলের শব্দ শুনে ড্রয়িংরুম থেকে উঁকি দিল অনু। এ সময় তো আব্বু আসে না। কে এল তাহলে? আম্মু দরজা খুলতেই খুশিতে লাফিয়ে উঠল অনু। ইয়ে-এ-এ, ম্যাজিক মামা এসেছে।

অনু ক্লাস ফোর-এ পড়ে। মামাকে সে খুব পছন্দ করে। মামার নাম সাজিক। তবে সে ম্যাজিক মামা বলেই ডাকে। অনুর কথা হচ্ছে, যে এত দারুণ দারুণ ম্যাজিক দেখাতে পারে তার নাম সাজিক হতে পারে না। তার



নাম হতে পারে ম্যাজিক। ম্যাজিক মামা। সেই ম্যাজিক মামাকে কাছে পেলে আর কি দূরে থাকা যায়? এক ছুটে মামার হাত টেনে ধরে সোফায় বসায় অনু।

মামা পিঠ থেকে ব্যাগপ্যাক নামিয়ে বলল, কী করছ অনু?

অনু প্লেটের বার্গারটা দেখায়। খাচ্ছি আর টিভি দেখছি। মামা শোনো, আজ শুধু ম্যাজিক দেখালে হবে না। সেই ম্যাজিক ট্রিক্স শিখিয়েও দিতে হবে। যাতে বন্ধুদের ম্যাজিক দেখাতে পারি। ঠিক আছে?

মামা মাথা নাড়ায়। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলে, অনু বলেছে, আর ঠিক থাকবে না? আচ্ছা, বলো তো, পাঁচ থেকে পাঁচ গেলে হাতে কী থাকে?

অনু হাতের দিকে তাকিয়ে বলে, আঙুলগুলো থাকে।

উত্তর শুনে হো হো করে হেসে ওঠে মামা। আচ্ছা, এবার বলো তো, তুমি আমাকে কীসের মতো পছন্দ করো?

অনু এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর হাতের বার্গারটা দেখিয়ে বলল, এই বার্গারের মতো পছন্দ করি। অনেক বেশি পছন্দ করি।

ম্যাজিক মামা হেসে ফেলল। তাহলে তিনটা খাবারের নাম বলো তো, যা খেতে তুমি অনেক পছন্দ করো?

অনু একটুখানি ভাবল। তারপর হাতের আঙুল গুনে বলতে শুরু করল- বার্গার, চিপস আর চকলেট।

ম্যাজিক মামা কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, এবার তবে এমন তিনটা খাবারের নাম বলো, যা খেতে মোটেও পছন্দ করো না?

অনু মামার দিকে তাকালো। বড়োদের ব্যাপার যেন কেমন! কখন কোন কথায় কপাল কুঁচকায়, কিছু বোঝা যায় না। সে তো ঠিক ঠিক তিনটা খাবারের নাম বলেছে। তারপরও কপাল কুঁচকানোর কী হলো? একটু ভেবে বলতে দেরি হয়েছে বলে?

মামার এবারের প্রশ্নটা পানির মতো সোজা। অনু ঝটপট বলল- ভাত, মাছ, দুধ। এগুলো খেতে একদম ইচ্ছে করে না।

ম্যাজিক মামা কী যেন একটু ভাবল। তারপর ব্যাগপ্যাক থেকে ল্যাপটপ বের করল। ল্যাপটপ অন করার বোতাম চেপে বলল, আজ ম্যাজিক হবে ল্যাপটপে। জানো তো, কম্পিউটারের মধ্যেও এক ম্যাজিশিয়ান আছে। তার নাম গুগল। গুগলকে যে কোনো প্রশ্ন করলে সে উত্তরটা বলে দেয়। চলো তো, গুগলকে প্রশ্ন করে দেখি, কী খেলে বাচ্চাদের শরীরের উপকার হয়?

অনু চোখ বড়ো বড়ো করে দেখল, মামা প্রশ্নটা লিখতেই উত্তর চলে এল। ম্যাজিক মামা পড়তে শুরু করল।

ভাতে শর্করা থাকে। যা শরীরের শক্তি জোগাড় করে দেয়। মাছে থাকে এমন উপাদান যা স্মৃতি ও মনোযোগ বাড়ায়। হাড় ও দাঁত মজবুত করে। দুধ শরীরকে বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে। এই খাবারগুলো খেলে বাচ্চারা শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান, মনোযোগী ও রোগমুক্ত থাকে।

অনু মুখ শুকনো করে জিজ্ঞাসা করল, মামা গুগল ম্যাজিশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করে দেখো তো, কী খেলে আমাদের শরীরের ক্ষতি হয়?

ম্যাজিক মামা প্রশ্নটা লিখে সার্চ দিতেই চলে এল উত্তর। ম্যাজিক মামা সেই লেখা পড়তে শুরু করল। বার্গার, চিপস খেলে শিশুদের পুষ্টির ঘাটতি হয়। চকলেট দাঁত ব্যথা ও পোকা ধরার কারণ। এসব খাবার মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।

অনু হাঁ হয়ে মামার দিকে তাকায়। এটা কী ধরনের ম্যাজিক হলো?

মামা হেসে বলে, এটা সুস্থ ও সুন্দর থাকার ম্যাজিক। কিছু খাবার আমাদের শক্তিশালী রাখে। রোগের বিরুদ্ধে করে ঢিসুম ঢিসুম। আর কিছু খাবার পেটে গিয়ে আমাদের শরীরকে করে ঢিসুম ঢিসুম। সেই খাবারগুলোকে আমরা চিনতে ভুল করি। এই ভুল আর করা যাবে না। এই ম্যাজিকটা কাল স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের শিখিয়ে দিতে পারবে না?

অনু জোর গলায় বলে, খু-উ-ব... পারব। ❑

গল্পকার



কদম ফুল

আহমেদ টিকু

বাদল দিনে কদম ফুলের
রূপ দেখেছ কেউ?
পাতার ফাঁকে হাওয়ায় ওঠে
কনক বরণ ঢেউ।

গাছতলাতে দাঁড়িয়ে গেলে
পাবে মিঠে ঘ্রাণ,
সোনার ওপর রূপার জ্যোতি
দেখে ভরে প্রাণ।

পাতার সবুজ আঁধার যখন
বসায় প্রাণের মেলা,
তার ভিতরে জমে ওঠে
আলোর বলের খেলা।

কোমল নরম পাপড়ি ফেলে
জানায় সম্ভাষণ,
কদম ফুলের রূপে-ঘ্রাণে
মাতে সবার মন।

কর্ণফুলি

হাফিজ রশিদ খান

পা ফেলি পা তুলি
যাচ্ছি আমি দেখব নদী কর্ণফুলি

ওই নদীটা ভালো লাগে
ওর কিনারে চর জাগে।

চরের ধারে একটা কুঁড়েঘর
গাছের ছায়ায় রোদের আলোয় সুন্দর।

দাদুর হাসি কাশফুলে আর সাদা মেঘে ভাসে
হাতটা ধরে দাদু আমায় কত কথা জিজ্ঞাসে।

তাই দাদুর বাড়ি যাই
ভাজা মাছ আর ডাল পেলে পেট পুরে খাই।

বর্ষাকালের বৃষ্টি সুখ

মোশতাক আহমেদ

আয় রে আষাঢ় আয় রে শ্রাবণ
আয় রে বর্ষাকাল
ডাক দিয়েছে সাগর, নদী
পুকুর, ডোবা, খাল।

ডাক দিয়েছে মেঘকন্যা
বৃষ্টি, প্লাবন, ঝড়, বন্যা
গ্রীষ্ম খরায় পুড়ে যাওয়া
তপ্ত মাটি গরম হাওয়া।

শুকনো পাতা ঝরে পড়ে
শ্রাবণ হাওয়া শীতল করে,
উষর মরুর ধূসর বুকে
আয় ঝরে যা বৃষ্টি সুখে-
দে ভিজিয়ে শুকিয়ে মরা
বনের তালতমাল।

পাহাড় টিলা বন-বনানী
নদীর জোয়ার মিষ্টি পানি
দে ভরে দে মেঘের রানি
বৃষ্টি দিয়ে পুকুরখানি।

আয় রে আষাঢ়, আয় রে শ্রাবণ
আয় রে বর্ষাকাল
নদীর জলে নাও ভাসিয়ে-
উড়িয়ে দে তুই পাল।

গল্প

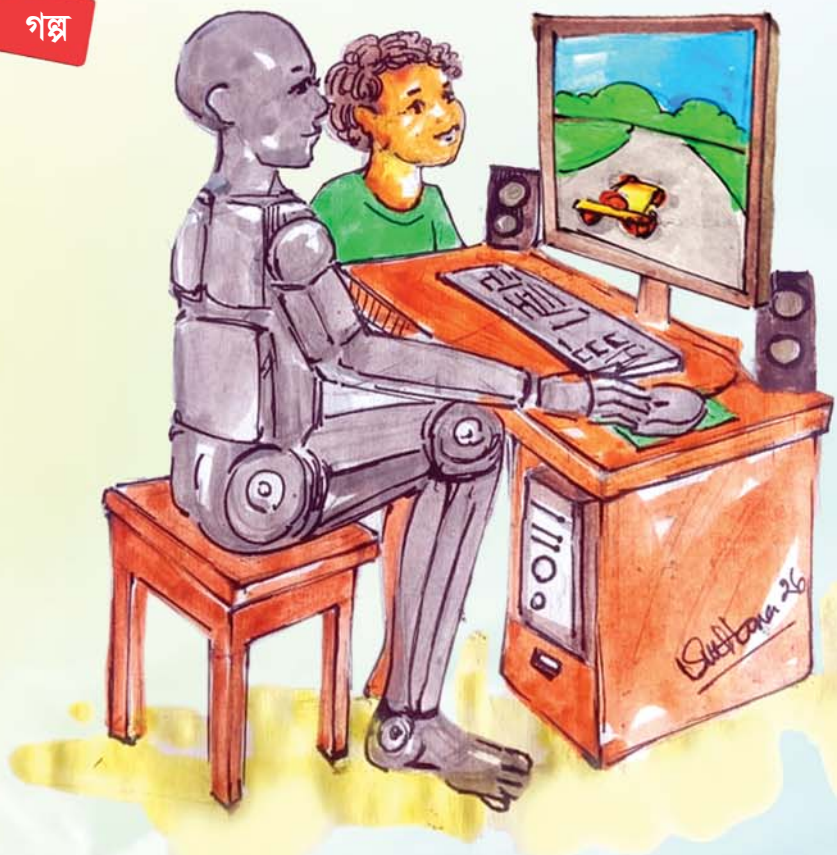

মানুষই হবে মানুষের বন্ধু

সারমিন ইসলাম রত্না

পৃথিবীতে তখন এমন এক সময় যখন চারপাশে সামাজিক অবক্ষয়ের জোয়ার। নতুন প্রজন্ম ভুলে গিয়েছিল আলোর পথ। হারিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। বড়োদের শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা– এসব ছিল না ওদের মাঝে। যা ইচ্ছে হয় তাই করে বেড়াত। বাবা-মা অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলেন, ওরা প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না। ওদের কোনো মানুষ বন্ধু থাকবে না। সব বাবা-মা সন্তানদের রোবট বন্ধু এনে দিলেন। রোবট বন্ধু কথা বলে, হাসে, খেলে, গল্প করে।

একদিন নয় বছরের ছোট্ট ছেলে রেহান ওর রোবট বন্ধুকে বলল, 'তোমার সঙ্গে বহুদিন ধরেই খেলছি। কিন্তু তুমি একই খেলা বারবার খেলো। আজ আমার সঙ্গে নতুন একটা খেলা খেলো।' রোবট বন্ধু বলল, 'আমি তো নতুন খেলা জানি না। যতটুকু আমার প্রোগ্রামে দেওয়া আছে, শুধু ততটুকুই জানি। যদি তুমি শেখাও, আমি শিখে নেব।' রেহান বিরক্ত হয়ে বলল, 'যা আমি জানি নাতা তোমায় কী করে শেখাবো? চলে যাও এখান থেকে।'

রেহানের মা অবাক হয়ে দেখলেন, রোবট বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে কেন?' রোবট হকচকিয়ে উত্তর দিলো, 'রেহান নতুন

খেলা খেলতে বলে। নতুন খেলা আমার প্রোগ্রামে নেই।' পরদিন রেহানের বাবা আরো উন্নত একটি রোবট এনে দিলেন এবং বললেন, 'রেহান, আশা করি তোমার এই নতুন রোবট বন্ধু সব রকম খেলা খেলতে পারবে।'

বাবা চলে যেতেই রেহান বলল, 'তুমি লুকোচুরি খেলতে পারো?' রোবট অবাক হয়ে বলল, 'লুকোচুরি! এই খেলার নাম আমি জানি না। চেষ্টা করতে পারি, যদি বুঝিয়ে বলো।' রেহান বলল, 'আমি লুকাবো, তুমি আমাকে খুঁজে বের করবে।' রোবট বলল, দুঃখিত। তোমাকে খুঁজে পাওয়ার মতো সেন্সর, গন্ধ চেনার এবং তাপমাত্রা বুঝতে পারার ক্ষমতা আমার সফটওয়্যারে নেই।' রেহান কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল, 'চলে যাও, চলে যাও তুমি।'

বাবা রেহানকে আরো কয়েকটি রোবট এনে দিলেন। কোনোটাই রেহানের মনের মতো হলো না। রেহান একা থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে গেল। চিন্তিত বাবা-মা রেহানকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেলেন। তারা বিস্মিত হয়ে দেখলেন, হাজারো শিশু বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। সবার মুখেই বিষণ্নতা। রেহানের বাবা-মা বুঝতে পারলেন, এই মুহূর্তে সব শিশুরই প্রায়ই একই অবস্থা। রেহান বহুদিন পর বুক ভরে শ্বাস নিলো আর বলল, 'বাবা, আমার অনেক শান্তি লাগছে।'

বাবা-মা প্রতিদিন রেহানকে নিয়ে পার্কে গেলেন। রেহান প্রাণ খুলে হাসল, দৌড়ালো। অনেকের সঙ্গেই রেহানের বন্ধুত্ব হলো। দূর হয়ে গেল বিষণ্নতা। সারা বিশ্বের শিশুদের মুখে আবার হাসি ফুটল। মানুষ বুঝতে পারল প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক না কেন, ভালোবাসা ও সম্পর্কের বিকল্প হতে পারে না। এই ঘটনা ধীরে ধীরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো– শিশুদের যথাযথ নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। তাহলেই দূর হবে সামাজিক অবক্ষয়। এখন থেকে রোবট নয়, মানুষই হবে মানুষের বন্ধু। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও বাচিক শিল্পী



ঢাকার পাখি

মাইশা মাহজাবিন

পাখিরা সব উড়ছে ঘুরছে
ঢাকার এই শহরে
গাছ নেই বসবে কোথায়? কেন
উঁচু ওই টাওয়ারে।

ফুটল পথে গাড়ির চাকা
বিকট হলো শব্দ
তাই তো পাখি উড়ে গেল
ভয়ে হলো জব্দ।

ডরে ভয়ে থাকে পাখি
ঢাকা শহর জুড়ে
সুখশান্তির বালাই কোথায়
ঢাকা শহর উড়ে।

পঞ্চম শ্রেণি, আল আমিন মডেল মাদরাসা, ট্রাক রোড, চাঁদপুর



বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রের ভেতরে ধুমকলার গাছ



ধুমকলার ইতিকথা

আবিদ করিম মুন্না

প্রায় ১৮০ বছর আগে ডেকোরেশনের জন্য নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বাবা পায়রাবন্দের জমিদার জহির উদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের জার্মানি থেকে নিয়ে আসেন ধুমকলার গাছ। একসময় তিনটির অস্তিত্ব থাকলেও এখন দুটো টিকে আছে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ ইউনিয়নের বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রের ভেতরে।

জমিদার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা থেকে পাওয়া ধুমকলার চারা ১৯৯৭ সালে স্মৃতিকেন্দ্রে প্রথম লাগানো হয়। তিন-চার বছর ফল পাওয়া যায়। এটি বাংলাদেশে একটি বিরল প্রজাতির এবং দুষ্প্রাপ্য কলাগাছ যেটা অন্য কোথাও আর দেখা যায় না।

ধুমকলা নিয়ে পায়রাবন্দের বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম দুলাল বলেন–ধারণা করা হয়, ১৮৪০ সালের দিকে জার্মানি থেকে বেশ কিছু গাছ নিয়ে এসেছিলেন বেগম রোকেয়ার বাবা। অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে থাকলেও একের পর এক বংশবৃদ্ধি প্রাকৃতিকভাবে চলমান ছিল।

সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার বীজ থেকেই চারা জন্মায়। পৃথিবীতে অন্য কোনো কলার বীজ থেকে চারা উৎপাদিত হয় কিনা এটা অজানা। কলা গাছের সাধারণত গুড়িকন্দ (Sucker)-এর মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়ে থাকে। স্ত্রী কলার বীজ না থাকায় গাছের গোড়া থেকে গজানো চারা আলাদা করে নতুন বংশবিস্তার করা হয়।

এমন কলা গাছ দেশের আর অন্য কোথাও নেই। তবে পায়রাবন্দ থেকে বাংলাদেশের বেশকিছু জায়গায় বীজ নিয়ে গিয়ে গত আড়াই দশকে অনেকেই চারা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্যে রংপুর তাজহাট জমিদার বাড়ির বাগান, রংপুর সেনানিবাস এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহতে-এ ফল ধরার খবর শুনতে পারা যায়।

স্মৃতিকেন্দ্রের অডিটোরিয়ামের লবির নিচে একটি ধুমকলা গাছ এখন ফল দেওয়ার অপেক্ষায়। এর আগেও ফল ধরেছে। আরেকটি চারাগাছ অফিস ভবনের ভেতরে লকলক করে বেড়ে উঠছে।

প্রতি বছর ৯-১১ই ডিসেম্বর পায়রাবন্দে বারোয়ারি রোকেয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রোকেয়া মেলা শেষ হলে মাসব্যাপী কাঠমেলা বা ফার্নিচার মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৪ সালের রোকেয়া মেলার সময় শেষবার ফল ধরেছিল। অনেক দর্শনার্থী ফলটির মোহময় রূপ দেখে এবং খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ধুম কলার বিশাল একটা কাঁদি হয়। উচ্চতায় প্রায় ৫ ফুট, যেটা সাধারণ কলা গাছের মতো নয়। বড়ো হলে কলা গাছের গোড়া পাম গাছের মতো গোল হয়, অনেকটা আগেকার সময়ের পিতলের কলসের মতো। একটা কাঁদিতে হাজার হাজার কলা হয় এবং আকার এক থেকে দেড় ইঞ্চি, অনেকটা মানুষের বুড়ো আঙুলের মতো।

কলার ভেতর হলুদাভ এবং প্রচুর বীজ, দেখতে মটর কালাইয়ের চেয়ে খানিকটা বড়ো। খেতে মিষ্টি, তবে বীজ বেশি থাকার কারণে খেতে খুব বিরক্ত লাগে।

লোককথা প্রচলিত আছে–কেউ যদি কলাগাছের ডাংলা (পাতার ডাঁটা) খেতে ইচ্ছে পোষণ করে তাহলে একদিন আগে গাছের কাছে গিয়ে বললে পরের দিন পাতা আপনা-আপনি হেলে থাকে। এছাড়া কলা গাছের ডাউগনা (ভেতরের ডাঁটার অংশ) সবজি হিসেবে খেতে মন্দ লাগে না।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Ensete glaucum পরিবার মুসেসি (Musaceae)। যেটি জিংগিবারেলেস (Zingiberales) বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের প্রধান দুটি বর্গের মধ্যে রয়েছে মুসা (Musa) (যার মধ্যে মিষ্টি ও রান্নার উপযোগী সাধারণ কলা অন্তর্ভুক্ত) এবং এনসেট (Ensete)। ❑

কৃষিবিদ, লেখক ও গবেষক



রিমঝিম বিষ্টি

মিয়াজান কবীর

রিমঝিম বিষ্টি এলে গুড়ুম গুড়ুম দেয়া ডাকে
রংধনু রং ছড়ায় আকাশ পথের বাঁকে বাঁকে।

রিমঝিম বিষ্টি এলে কোলা ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং
সুরে সুরে লাফায় ড্যাঙর ড্যাং।

রিমঝিম বিষ্টি এলে নদীর বুকে জোয়ার আসে
জোয়ার জলে উজান-ভাটি পানসি-বজরা ভাসে।

রিমঝিম বিষ্টি এলে উপচে পড়ে নদীর পাড়ি
গাঁয়ের বধূ নদীপথে যায় যে নাইয়র বাপের বাড়ি।

রিমঝিম বিষ্টি এলে কেয়াবনে ফুলের হাসি ফোটে
ফুলের ঘ্রাণে ভোমর-অলি নিত্য এসে জোটে।

রিমঝিম বিষ্টি এলে কুসুম কুসুম ছন্দতালে
নূপুর বাজে ঝুন্‌ঝুন্ গাছের ডালে-ঘরের চালে।

গল্প

পাথর কন্যা

মামুন সরকার

এক দেশে এক রাজা আর রানি ছিল। বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল তাদের রাজ্য। রাজার কোনো সন্তান নেই বলে রাজ্যের প্রজারা রাজাকে চোখের আড়ালে নানা কথা বলে। এ কথা রাজার কানে পৌঁছাতেই তিনি মন খারাপ করেন। প্রজারা তো ঠিকই বলছে। সারা রাজ্যজুড়ে রাজবাড়ি। তার ভিতরে বিশাল পদ্মদিঘি। নানান মৌসুমি ফুল আর ফলে ভরপুর রাজবাড়ি। বাড়ি ভর্তি দাসদাসী আর পাইক বরকন্দাজে সুসজ্জিত রাজদরবার। কিন্তু সেই রাজদরবারে নেই কোনো রাজপুত্র, রাজকন্যা। মরে গেলে কে হবে এই বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকার। একটা কালো ছায়া রাজা-রানির মনকে সবসময় মলিন করে রাখে। রাজা এ কারণে দিবালোকে তিনি কোথাও বের হন না। যা করেন রাতের আঁধারে। এক পূর্ণিমা রাতে কাউকে কিছু না বলে রাজবাড়ি ছেড়ে গহীন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ চলতে থাকেন। সাথে কোনো পাইক-বরকন্দাজ নেই। পথ চলার বাহন একটা গাধা। চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। গাছগাছালির ডালপালা পাতার ফাঁক ভেদ করে জোছনা আলো-আঁধারে লুকোচুরি খেলা করে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা সরু রাস্তা ধরে রাজা পথ চলছেন। কোথায় যাবেন ঠিকানা জানা নেই। নিশাচর পাখি আর ঝরাপাতার মড়মড় শব্দে গা ছমছম করা এক ভয়ংকর পরিবেশ। অনেক পথ চলার পর একটা অদ্ভুত শব্দ করে গাধাটা থমকে দাঁড়ায় একটা জটাধারী বটবৃক্ষের সামনে। রাজা খেয়াল করলেন বটবৃক্ষের গোড়ায় ধবধবে সাদা পোশাকে কেউ একজন ধ্যানে মগ্ন। রাজা



গাধার উপর থেকে নেমে ধ্যানমগ্ন মানুষটির সামনে গিয়ে সালাম পেশ করলেন। ধ্যানমগ্ন দরবেশ বাবা সালামের উত্তর দিয়ে জানতে চাইলেন- কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?

সবকিছু বলো, নাই কোনো ভয়।

রাজা বলেন,

আমি এই বৃহৎ রাজ্যের রাজা
নিজকে নিজে দিছি সাজা
অঢেল আমার টাকাকড়ি
নাই তো কোনো পোলাপুরি।
দিনকে দিনে হছি বুড়া
প্রজা সকল বলে আঁট খুঁড়া।
পেতাম যদি রাজপুত্র রাজকন্যা
রাজ্যময় বয়ে যেত খুশির বন্যা।

দরবেশ বাবা বলেন-

হুম! বুঝেছি উত্তরাধিকার চাই
প্রভুর দয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই।
তিনি চাইলে পেতে পারো রাজপুত্র-পুত্রা
দান করতে হবে অনেক মুদ্রা
তোমার রাজ্যে আছে যত গরিব দুখি
খাদ্য দিয়ে করো তাদের সুখি।
যারা অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত
তাদের সেবায় নিজকে রাখো ব্যস্ত।
দেখবে একদিন কেউ বলবে না আঁট খুঁড়া
রাজ্যময় দৌড়াবে রাজপুত্র ঘোড়া।
তবে পুত্রের বয়স হলে ষোলো বছর ছয় মাস
খুঁজে বেড়াবে সে পাথর কন্যার বাস।

রাজা বলেন,

কোন রাজ্যে পাথর কন্যার বাস
যদি দিতেন একটু আভাস।

দরবেশ বাবা বলেন,

ফুল যখন ফোটে গাছে
সেথায় দেখো ভোমরা নাচে।
প্রভুর দরবারে দু' হাত তুলে
চোখ বন্ধ করে
মনের কথা বলি মন খুলে।

দোয়া শেষে দরবেশ বাবাকে আর দেখতে পেলেন না রাজা। আশ্চর্য ব্যাপার। মুহূর্তে তিনি কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন। সামনে যে বটবৃক্ষ ছিল তাও চোখে পড়ছে না। রাজা তাঁর গাধার পিঠে বসে রাজবাড়ির সামনে। চোখের পলকে আচানক ঘটনা ঘটে গেল। যার হিসাব তিনি মিলাতে পারছেন না। তবে দরবেশ বাবার কথায় রাজার মনে খুশির নহর।

কাক ডাকা ভোরে তিনি বের হলেন। কার কী দুঃখকষ্ট নিজ চোখে দেখে মন্ত্রী মশাইকে ডেকে বললেন - রাজ্যে যত গরিব-দুখি আছে তাদের সবার ঘরে এক বছরের চাল-ডাল যা যা লাগে তা পৌঁছে দিন। অকাল বানে যাদের বাড়িঘর ডুবে গেছে তাদের বাড়ি করে দিন। আগামী এক বছর কৃষকদের কাছ থেকে কোনো খাজনা নেবেন না। যাদের ফসল তলিয়ে গেছে তাদের চাষাবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করুন। আমি প্রজাদের মাঝে কোনো দুঃখ-দুর্দশা দেখতে চাই না। রাজভাণ্ডারে যত খাদ্য মজুত আছে সব বিলিয়ে দিন।

মন্ত্রী বলেন- আজ্ঞে মহারাজ। আপনার আদেশ পালনে কোনো ত্রুটি হবে না।

হঠাৎ রাজার এমন পরিবর্তনে প্রজারা হতবাক। হতবাক রাজ্যের মন্ত্রী, পাইক-বরকন্দাজ সকলে। যেখানে খাজনা না দিলে কৃষকদের শাস্তি পেতে হতো, সেখানে এক বছরের খাজনা মওকুফ এবং এক বছরের খাদ্য কোনো শর্ত ছাড়া বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। যা সত্যি সত্যি স্বপ্নের মতো। প্রজারা কখনো এমনটা আশা করেননি। খাদ্য পেয়ে গরিব-দুখি প্রাণ খুলে দোয়া করল।

বছর না ঘুরতেই রানির কোলজুড়ে এল এক ফুটফুটে রাজপুত্র। রাজবাড়িতে খুশির জোয়ার। তিনি এক পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন। এই সুসংবাদে প্রজারাও খুশি।



দিন যায় মাস যায়। তারপর বছর। এভাবে ষোলো বছর। রাজপুত্র টগবগে এক কিশোর। রাজপুত্রের ইচ্ছে হলো শিকারে যাবে। রাজা-রানি দু'জনই রাজি। মন্ত্রী মশাইকে ডেকে সব ব্যবস্থা নিতে বললেন। মন্ত্রী মশাই একটি পঙ্খিরাজ ঘোড়ার সাথে বডিগার্ড দিলেন। কিন্তু কিশোর রাজপুত্র একা যাবার অনুমতি চাইল। রাজা-রানি কোনোভাবেই একমাত্র পুত্রকে একা ছাড়তে নারাজ। কিশোর রাজপুত্র একাই যাবেন এটাই তার সিদ্ধান্ত। কী আর করা, রাজা-রানি রাজি হলেন। ঘোড়ার পিঠে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি আর শিকারের জন্য তীর-ধনুক নিয়ে পঙ্খিরাজ ঘোড়া নিয়ে ছুটল। সাত সাতটি ধূ-ধূ মাঠ পার হয়ে পঙ্খিরাজ পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেল। কিশোর রাজপুত্রও ছিটকে পড়ল মাটিতে। একটা পাথরে আঘাত লেগে কপালের খানিকটা কেটে গেছে। পাথরের পাশেই ছিল একটা কাঠের বাক্স। বাক্সটা খুলে দেখল ছোটো একটা চিরকুট। তাতে লেখা,

রাজপুত্র সামনে পদ্ম পুকুর
যখন হবে মধ্য দুপুর
ঝাঁপ দিয়ে জলে
যাবে মাটির তলে

সেখানে এক রাজকন্যা থাকে
উদ্ধার করে আনো তাকে।

কিশোর রাজপুত্র পঙ্খিরাজ ঘোড়াটিকে একটা গাছের ছায়ে বেঁধে ঠিক মধ্য দুপুরে পদ্মজলে ডুব দিয়ে মাটির নিচে চলে যায়। কাচের মতো স্বচ্ছ জলের নিচে রাজপুত্র একটা বড়ো পাথর খুঁজে পায়। ঝকঝকে রূপো রঙের শ্বেতপাথর। পাথর ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। রাজকন্যাকে না পেয়ে চলে আসবে এমন সময় আওয়াজ আসে,

শুনেন রাজপুত্র নন্দা
আমি পাথর কন্যা
রাজকুমারি ছন্দা।

কিশোর রাজপুত্র থমকে গেল। কোনো মানুষজন নেই। তবে কথা বলছে কে? রাজপুত্র বলে,

শুনেন পাথর কন্যা
কোথায় আপনি
সত্যি করে কন্ না

দুই

পাথর কন্যা বলে,
শুনেন রাজপুত্র মনদি
পাথরের ভিতরে আমি বন্দি।
আমার কথা মানেন
পাথরে আঘাত হানেন।
ভাঙতে পারলে পাথর
আপনি হবেন আমার বর।

পাথর কন্যার কথামতো কিশোর রাজপুত্র পাথরে আঘাত হানে। পাথর সহজে ভাঙে না। নিরুপায় হয়ে কিশোর রাজপুত্র পাথরটি নিয়ে উপরে উঠে আসে।

অন্যদিকে রাজা-রানির চোখে ঘুম নেই। ছয় মাস পার হয়ে গেল রাজপুত্র ফিরার নাম নেই। পুত্রশোকে রাজা-রানির সকল স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। রাজদরবারের সকল পাইক বরকন্দাজ, নাজির, উজির, সেনাপতি সারা রাজ্য তন্নতন্ন করে রাজপুত্রকে খুঁজে। কিন্তু রাজপুত্রের কোনো খোঁজ পায় না। এবার রাজা নিজেই ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন। তিনিও ব্যর্থ হলেন। রাজা ঘোষণা করলেন যদি কেউ রাজপুত্রের সন্ধান দিতে পারে তাকে রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেওয়া হবে। অর্ধেক রাজ্যের লোভে পাইক-বরকন্দাজ, প্রজা সকলে ছুটল পূর্ব থেকে পশ্চিমে। উত্তর থেকে দক্ষিণে। হাওর বাঁওড়, নদীনালা, খালবিল, ঝোপঝাড়, তেপান্তরের মাঠ সব খুঁজে হয়রান। কোথাও রাজপুত্রের খোঁজ মিলল না।

রাজা আবার গাধার পিঠে চড়ে গভীর রাতে একা একা বের হলেন। সেদিনও ছিল পূর্ণিমার রাত। আঁকাবাঁকা পথ মারিয়ে সেই বটবৃক্ষের সামনে এসে গাধা থমকে দাঁড়ালো। রাজা দেখলেন বটবৃক্ষের গোড়ায় সাধু বাবা ধ্যানে মগ্ন। গাধার পিঠ থেকে নেমে যথারীতি সালাম দিলেন। সাধু বাবাও সালামের উত্তর দিয়ে জানতে চাইলেন,

স্বাগতম মহামান্য রাজা মশাই
খোলাকাশে কোথায় যে বসাই।
রাজা বললেন,
বসব না দরবেশ শাঁই
ছয় মাস গত হলো পুত্রের খোঁজ নাই।
তাই তো মনে বড়ো দুঃখ
মেজাজ হয়ে আছে রুক্ষ।

দরবেশ বলেন,

শান্ত হোন রাজা মশাই মন করুন শান্ত
খুশি মনে রাজা মশাই বাড়ি ফিরে যান তো।
দূর করুন মনের কালো
পুত্র আপনার আছে ভালো।
মওজুদ আছে যত সোনাদানা
বিলিয়ে দিন সবার মাঝে
রাখবেন না হাতে এক আনা।
সুখে প্রজারা করবে হইচই
রাজপুত্র ফিরবে শীঘ্রই।

রাজা বলেন,
ঠিক আছে দরবেশ শাঁই
তাহলে রাজ্যে ফিরে যাই।

দরবেশ বাবার কথামতো রাজা বাড়ি ফিরেন। পরদিন সকালে মওজুদ সব সোনাদানা গরিব প্রজাদের মাঝে

বিলিয়ে দেন। প্রজারা রাজপুত্রের মঙ্গল কামনায় দোয়া করে।

অন্যদিকে, রাজপুত্র পাথর নিয়ে আছে এক মহা বিপদে। কোনোকিছুতেই সেই পাথর ভাঙতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে পাথরটা আবার জলে ফেলতে যাবে এমন সময় পাথর কন্যা কান্না করে বলে, আমায় আর ফেলো না জলে।

তোমার পিছনে একটা ডালিম গাছে
কালো একটা ভোমরা আছে
ভোমরাটা বড়ো ভণ্ড
তাকে মারতে পারলে
পাথর হবে দ্বিখণ্ড।

যেই কথা সেই কাজ। পিছন ঘুরে একটা ডালিম গাছ দেখতে পায়। গাছের মগডালে একটা কালো ভোমরা। কিন্তু তা হাতের নাগালের বাইরে। অনেক চিন্তাভাবনা করে মাথায় একটা বুদ্ধি এল। হাতে দুটো চ্যাপটা পাথর নিয়ে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার পিঠে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরস্থিরে দুই হাতের পাথর দিয়ে ভোমরাটাকে আচমকা চাপ দিতেই একটা বিকট শব্দ হয়। আর শব্দের সাথে সাথে পাথর দ্বিখণ্ডিত হলে ভিতের থেকে বেরিয়ে আসে এক রাজকন্যা। গায়ে সোনাদানা খচিত মখমলের পোশাক। যা রূপবতী রাজকন্যাদের গায়েই মানায়। কিশোর রাজপুত্র আনন্দে আটখানা। মনের মতো একটা সঙ্গী পেয়েছে। কালবিলম্ব না করে রাজপুত্র পাথরকন্যাকে পঙ্খিরাজে তুলে রাজ্যে ফিরে আসে। রাজা-রানি পুত্রসহ রাজকন্যাকে পেয়ে মহা খুশি। রাজ্যময় সুখের বন্যা। ❑

শিশুসাহিত্যিক





সাঁতারু

নাসরীন খান

চার, পাঁচ বছর বয়স থেকে মামুন সাঁতার শিখে এখন পুরো দুরন্ত সাঁতারু সে। এ তল্লাটে ওর মতন আর একজনও নেই। বাবা ছোটোবেলায় যখন গোচ্ছিল করাতে নদীর ঘাটে নিতো। তখন বাবার কোমর ধরে একাই পা দুলাতে থাকত মনের আনন্দে। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিত নিজেই। কথা খুব একটা স্পষ্ট হয়নি তবুও বলতো - বাবা, আমি পায়ি, সাঁতার পায়ি। তুমি ছাও, আমারে ছাও অর্থাৎ ছেড়ে দাও।

বাবা হাসতে হাসতে বলত, এহন না বাবা, আরেকটু বড়ো অও। আমি তোমারে শিখাইবাম। কেমনে তাড়াতাড়ি বেহেইরে (সবাইকে) হালাইয়া আগে যাওয়ন (যাওয়া) যায়। কেমনে পানিত ভাইসা থাহন যায় বেশিক্ষণ।

ঘরে এসে মামুনের বাবা ওর মাকে ওভাবেই বলত যেমন করে মামুন বলত।

মা আনন্দে হেসে কুটিকুটি হতো। মা গর্বের সাথে বলত– ঠিহই একদিন বড়ো অইয়া আমার পোলা সাঁতারু অইব।

এখন কত আর হবে বয়স, ১২ হয়ত। মা- বাবা ওর সঠিক জন্ম তারিখের হিসাব রাখেনি। লেখাপড়া জানেন না তাই তারা জন্ম তারিখ সঠিকভাবে কেউ জানে না, অনুমান করে বলে। বাবা অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করেন। যেহেতু এই অঞ্চলটি ভাটি এলাকায়, বছরে ছয় মাস কৃষিকাজ হয় বাকি ছয়মাস পানি বন্দী থাকায় মাছ শিকার করে সংসার চলে তাদের। কিছু মাছ বিক্রি করে গ্রামে ঘুরে ঘুরে। আবার কিছু মাছ শুঁটকি করে রাখে রোদে শুকিয়ে। যখন পানি শুকিয়ে হাওরে ফসল ফলাতে হয় তখন তেমন মাছ ধরা যায় না। ঘরে শুঁটকি মাছ থাকলে নিজেদের খাওয়া চলে। টাকার প্রয়োজন হলে বিক্রি করে কিছু টাকাও পাওয়া যায়।

আবার বর্ষার চিত্র ভিন্ন। এই এলাকায় বর্ষায় তেমন সবজির চাষ হয় না। মাঠঘাট সব পানিতে তলিয়ে যায়। মামুনের মা ভীষণ পরিশ্রমী। তখন লাউ গাছ ছাড়া আর কিছু চাষ হয় না। ঘরের আশপাশে কোনোরকম দু-একটা গাছ বুনে। এই লাউই তখন সবজির ভরসা। উজান এলাকায় বাঁশ গাছ হয় প্রচুর। এছাড়া পাটি, কুলা, টুকরি, হাত পাখা, ঝুড়ি এসব বুনে বাজারে বিক্রি করে জীবনযাপনের চেষ্টা চলে তাদের।

ওদের গ্রামে হাই স্কুল নেই বলে নৌকা করে পাশের গ্রামের স্কুলে যায় মামুন। ওর বাবা সবসময় নৌকা

বেয়ে স্কুলে দিয়ে আসে। আবার বিকেলে কাজ থেকে এসে নিয়ে আসে। এভাবে চলছে মামুনের পড়ালেখা। ও ছাত্র হিসেবে বেশ ভালো। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে মেধায় ৪র্থ বা ৫ম স্থানে থাকে। স্যাররা ওকে নিয়ে আশাবাদী। মামুনের বাবার সাথে স্কুলের অংক শিক্ষকের দেখা সেদিন। তিনি মামুনের বাবার উদ্দেশে বলেন-

- মিয়া! তোমার পোলারে কষ্ট অইলেও স্কুলে পাডাইও। পড়ালেহায় ভালা। অক্করে (একেবারে) লেহাপড়াত থাইক্যা বাদ দিয়া দিও না।

- আইচ্ছা স্যার দোয়া করইন যে আমরার লাইগা।

দু-তিনজন ভালো বন্ধু আছে গ্রামে মামুনের। ওরা সারাক্ষণ ওকে উৎসাহ যোগায়। ও যাতে সেরা সাঁতারু হয় এই অঞ্চলের। এতদিনে সত্যি ও সাঁতারটাকে ভালো করে রপ্ত করে ফেলছে!

একদিন বিকেলে হারিস আর কুতুবউদ্দিন এর সাথে ডাংগুলি খেলছিল ও। এমন সময় হারিসের একটা কথা মনে পড়ে গেল। মামুনকে বলল,-

আইজ আর খেলতাম না। তোর লগে একটা কথা আছে। আমরার বাড়িতে ল (চল) যাই। মামুন অতি উৎসাহে বারবার প্রশ্ন করছে,

- কী অইছে? আমরারে কওন যায় না?

- উহু,অহন কইতাম না। আগে বাড়িত যাই বাদে কইয়াম। এইডা হুনলে তুই আশ্চার্য অইয়া পরবি অক্করে (একেবারে)।

ঠিক আছে ল (চল) যাই।

বাড়ি গিয়ে হারিস মায়ের কাছ থেকে ট্রাংকের চাবি নেয়। ভীষণ উৎসুক বাকিরা। তার মধ্যেও এমন ভাব যেন কোনো গুপ্তধনের সন্ধান দিবে সে!

তাকের উপর থেকে ট্রাংকটা নামিয়ে মাটিতে রাখল। অতি যত্ন নিয়ে ট্রাংকটি খুলে ফেলল। একটা বড়ো কাগজ বের করে ওদের দেখিয়ে বলে-

-ভালা একটা খবর আছে। জাংগিরপুর স্কুলের খেলার স্যার যারা হাতার (সাঁতার) পারে হেরার লাইগা একটা বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা করছইন (করেছেন)। কালকা (গতকাল) আমি জানতাম পারছি। এইহানো (এখানে) বেকতা (সবকিছু) লেহা আছে।

তিনজনের একত্রে শব্দ করে পড়ায় তেমন কিছু বোঝা গেল না। মামুন বলল, আমি পড়ি, তোরা হুন (শুন)। মামুন পুরো খবরটা পড়ে ফেললো সুন্দর করে। ভীষণ উত্তেজিত সে। সাথে ওরাও।

-হুনছস (শুনেছিস) হাতার খেলাত যে জিতব তারে একটা টেলিভিশন দিব।

- হ্যাঁ, এইডা মামার কাছতো (কাছ থেকে) হুনছি।

- ইস, যদি আমি ফাইয়ালাই (পেয়ে যাই) তরা (তোরা) বেহেই আমার ঘর গিয়া টেলিভিশন দেহিস।

- কালহা (কালকে) আমরা বেহেই জাইবাম (যাব)। গিয়া তহনই নামডা লেহাইয়ালবাম (লিখে ফেলব)।

আইচ্ছা তাইলে হেই কথাই রইল। সহালে (সকালে) ভাতটা খাইয়াই রওনা অইবাম।

মামুনের বাবা গিয়ছিল বাজারে। ফিরতে অনেক রাত হলো। তখন মামুন খুব আগ্রহ নিয়ে বাবাকে সাঁতার প্রতিযোগিতার খবর জানায়।

পরদিন সকালে ফরমটা পূর্ণ করে স্যারের সাথে কথা বলে জানতে পারল আর দশদিন পর ফাইনাল খেলা। প্রায় ৪ মাইলের মতন হাওরে সাঁতার কেটে পার হতে হবে। খুব আশাবাদী হয়ে উঠল মামুন। ওরা সবাই উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

এখন থেকে প্রতিদিন ওকে সাঁতার এর অনুশীলন করতে হবে। কিভাবে সাঁতরালে ভালো দম থাকবে, মাথা কেমন পজিশনে রাখতে হবে, কতটুকু সময় নিয়ে এগুতে হবে লক্ষ্য স্থলে, কোথা থেকে শুরু হবে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে নানা বিষয় স্যার বুঝিয়ে দিয়েছেন। মামুন সেইভাবে রপ্ত করতে লাগল।

বর্ষায় থইথই পানি। নদী আর হাওর পার্থক্য করা যায় না। একসাথে হয়ে পানিতে মিশে গেছে সব জায়গা। শুধু পাটক্ষেতগুলো পাড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে জানান দেয় যে এখানে পানির তল অল্প। তাছাড়া কিছুতেই বোঝার উপায় নেই নদী আর হাওর এর সীমানা। হাওরের টলটলে পানি চারপাশে। মনের আনন্দে সাঁতার কাটে মামুন। কয়বার ওই পাটক্ষেত পর্যন্ত যেতে আর আসতে পারে তার হিসাব করে ওর দুই বন্ধু। মা ডেকে ডেকে নিয়ে খাওয়ায়। নইলে সে খেতে যাবে না। কি যে এক ঘোরে পরল!



মনে মনে সংকল্প করে সে ফার্স্ট হয়ে টেলিভিশনটা জিতে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে ।

এভাবে প্রতিদিন সকালে মামুন সাঁতার দিয়ে নদীর এপাড় ওপাড় করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। দেখতে দেখতে সাঁতার প্রতিযোগিতার দিন চলে আসলো। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাবার আনা নতুন জামাটা গায় দিল। মা ভাত রান্না করে একটা ডিম ভেজে ওকে খেতে দিল। খাওয়া শেষ করে মামুন আর তার বাবা রওনা হলো নদীর ঘাটে। বাবা নৌকা চালিয়ে ওই হাওরে নিয়ে যায়।

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। মা ছেলের জন্য দোয়া করতে লাগল। জাংগিরপুর থেকে কদমশ্রী পর্যন্ত সাঁতরে যাবে সকল প্রতিযোগী। মামুন সাঁতরে এগুতে লাগল। প্রায় অর্ধেকের বেশি চলে আসলো। ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল। সে দুই জনের পিছনে আছে। তবে ভীষণ সাহস রাখল মনে। আর নিজে নিজেই বলতে লাগল, আমিই ফার্স্ট অইবাম, অয়নই লাগব। তার আগে এখন একজন আছে। দ্রুত এগুতে লাগল সামনের দিকে। তার হৃৎস্পন্দন যেন সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে। কাছাকাছি এসে দু-চোখ বন্ধ করে সাঁতার দিল। এবার সবাইকে পিছনে ফেলে একেবারে সবার আগে। স্যারে বাঁশি বাজতে লাগল। এরপর চোখ খুলে দেখে সে সবার আগে। তারপর যেন শরীর ছেড়ে দিল। আর বলতে পারবে না কখন দুজন ধরে ওকে নৌকায় উঠিয়ে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে। একজন ধরে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। মুখে পানির ঝাপটা দিতেই চোখ খুলে দেখে বাবা তার সামনে। বাবাকে জড়িয়ে ধরল আনন্দে। বাবা আনন্দে কেঁদে ফেলল। উপস্থিত সবাই হাততালি দিচ্ছে।

গ্রামে দ্বিতীয় একটা টেলিভিশন আসলো। তার বন্ধুর মামা মফস্বলের পত্রিকায় বড়ো হেডলাইনে খবর ছাপলেন, 'সাঁতারু মামুন' শিরোনামে। গ্রামের চেয়ারম্যান চাচা কুদ্দুস বয়াতিরে ডেকে গানের দল নিয়ে গান করতে বললেন। খুশিতে সাড়া গ্রামের যুবক ছেলেরা চাঁদা তুলে জিলাপি কিনে বাচ্চাদের খাওয়ালো। মামুন গ্রামের গর্ব হয়ে উঠল তার পরিশ্রম আর মনোবলের জন্য। ❑

কবি ও সাহিত্যিক

জাতীয় ফুলের স্বীকৃতির গল্প

হুমায়ূন কবির

পৃথিবীর সব দেশেরই জাতীয় ফুল রয়েছে। জাতীয় ফুল একটি দেশের পরিচিতি বহন করে। সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত অথবা বিভিন্ন মানদণ্ডের নিরিখে বা একটি দেশের জনগণের আনুষ্ঠানিক মতামতের ভিত্তিতে সে দেশের পরিচিত এবং জনপ্রিয় একটি ফুলকে ওই দেশের জাতীয় ফুল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যেমন- সাদা শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। এই ফুলটি বাংলাদেশের জলাভূমিতে স্বাভাবিকভাবে জন্মায় এবং বর্ষাকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর দেখা যায়। শাপলা দেশের নদীনালা, বিল-হাওরের সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে এটি দেশের একটি প্রতীকী ফুল হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ ধরনের ফুলকে জাতীয় ফুলের মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এসো জেনে নেই পৃথবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুলের স্বীকৃতির গল্প।

বাংলাদেশঃ আমরা সবাই জানি যে, সাদা শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। যার ইংরেজি নাম 'ওয়াটার লিলি'। শাপলা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। সাদা শাপলা হলো বাংলাদেশের জনগণের প্রতীক। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, শাপলার সাদা রং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আর পাপড়িগুলোর মতো দেশের মানুষকে একত্রিত করে। তাই শাপলা ফুল অনেক রঙের হলেও কেবল সাদা শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের মর্যাদা পেয়েছে। আরেকটি কারণ হলো, বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। তাই সারা দেশেই শাপলা পাওয়া যায়। দেশের আনাচে-কানাচে নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও পুকুর-ডোবা ছড়িয়ে আছে। আর এসব জায়গায় সারা বছরই প্রচুর শাপলা ফোটে।



শ্রীলঙ্কা: শাপলা ফুল শ্রীলঙ্কারও জাতীয় ফুল। তবে সাদা নয়, নীল শাপলা। শ্রীলঙ্কায় এই ফুল 'নীল



মাহানেল' নামে পরিচিত। শ্রীলঙ্কার ভাষায় নীল থেকে এ ফুলকে ইংরেজিতে অনেক সময় 'ব্লু লোটাস' বলা হয়। দেশটির বিভিন্ন পুকুর ও প্রাকৃতিক হ্রদে এ ফুল ফোটে। ওখানকার বৌদ্ধদের বিশ্বাস গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপে পাওয়া ১০৮টি শুভ চিহ্নের মাঝে একটি ছিল এই শাপলা ফুল। তাই নীল শাপলাকে শ্রীলঙ্কার জাতীয় ফুল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ভারত: ভারতের জাতীয় ফুল পদ্ম। ইংরেজি নাম লোটাস। বহু বছর ধরে এই ফুল ভারতের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সৌভাগ্য, সম্মান ও দীর্ঘ জীবনের প্রতীক।



ভারত ছাড়া ভিয়েতনামেরও জাতীয় ফুল পদ্ম। এছাড়া মিশরে এই ফুলকে সূর্যদেবের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়।

জাপান: জাপানের জাতীয় ফুলের নাম চেরি । এই ফুলের স্থানীয় নাম সাকুরা। প্রাচীনকাল থেকেই জাপানিরা এই ফুলের চাষ করে আসছে। চেরি ফুল



তাদের চেতনার শক্তি এবং কর্ম উদ্দীপনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। জাপানি ১০০ ইয়েনের মুদ্রায় চেরি ফুলের প্রতীক খোদাই করা রয়েছে। জাপানিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে সাকুরার প্রিন্টের বহুল ব্যবহার করে থাকে।

স্কটল্যান্ড: ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের থিসল ফুল স্কটল্যান্ডের জাতীয় ফুল। এই ফুলের গায়ে কাঁটাও



আছে। ঐতিহাসিকদের মতে, এই ফুলের কাঁটার কারণে যুদ্ধের সময় স্কটিশরা নরওয়ের সৈন্যদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তখন থেকে এই ফুলটি তাদের আত্মরক্ষার প্রতীক।

নেপাল: হিমালয় কন্যা নেপাল। পাহাড় বেষ্টিত এ দেশটির জাতীয় ফুল উজ্জ্বল লাল রঙের



রডোডেনড্রন। এটি মূলত গোলাপ গাছ। একে 'কিং অফ শ্রাবস'ও বলা হয়। নেপালি ভাষায় এ ফুলকে বলা হয় 'লালী গুরানস'।

সুইজারল্যান্ড: এডেলওয়াইজ সুইজারল্যান্ডের জাতীয় ফুল হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর জেনেভা ও জুরিখের পুষ্প প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রজাতির



এডেলওয়াইজ ফুলের সমারোহ দর্শনার্থীদের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। 'নোবল হোয়াইট' অভিজাত সম্প্রদায় ও স্বচ্ছতার প্রতীক। পাহাড়ের অনেক উপর ফোটে এই ফুল।

পাকিস্তান: পাকিস্তানের জাতীয় ফুল হলো সাদা জুঁই, যা স্থানীয়ভাবে চামবেলি নামে পরিচিত। অপূর্ব সৌন্দর্য, মিষ্টি সুবাস এবং পবিত্রতার প্রতীক হওয়ায় ১৯৬১ সালের ১৫ই জুলাই এটিকে পাকিস্তানের জাতীয়



ফুল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর মনোমুগ্ধকর সুবাস, সাদা নির্মল পাপড়ি এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে এটি পাকিস্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতীক। এটি শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, সুগন্ধি শিল্প, বাগান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সীমিতভাবে লোকজ চিকিৎসাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাশিয়া: বহু বছর ধরে ক্যামোমিল রাশিয়ার জাতীয় ফুল হিসেবে পরিচিত। এই ফুল থেকে একরকম ভেষজ চা তৈরি করা হয়, যা ক্যামোমিল নামেই



পরিচিত এবং স্বাস্থ্যকরও। চায়ের সঙ্গে এই ক্যামোমিল ফুল মিশিয়ে খেলে মানসিক চাপ দূর হয়। একইসঙ্গে এটি অন্ত্রের গ্যাস ও পেশীর ব্যথা দূর করতে, ক্যান্সার এবং ক্ষত নিরাময়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অস্ট্রেলিয়া: গোল্ডেন ওয়াট্‌ল অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ফুল। জাতীয় ফুলের নামে অস্ট্রেলিয়ায় পয়লা



সেপ্টেম্বর ওয়াট্‌ল দিবস পালিত হয়। সাধারণত এই ফুল হলুদ হলেও কিছু প্রজাতি সাদা রঙেরও হয়। সুগন্ধী হওয়ায় এই ফুল পারফিউম ও সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ইংল্যান্ড: গোলাপ ইংল্যান্ডের জাতীয় ফুল। গোলাপ শুধু ইংল্যান্ডের জাতীয় ফুলই নয়, এটি ভালোবাসা, সৌন্দর্য, আশা, সম্মান ও ঐক্যের প্রতীক। ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক সংস্কৃতিতে



গোলাপের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যময় রং ও সুগন্ধের কারণে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ফুলগুলোর একটি হিসেবে আজও সমান জনপ্রিয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা: দেশটির জাতীয় ফুল প্রোটিয়া। ১৭৩৫ সালে গ্রীক দেবতা প্রোটিয়াসের নামানুসারে ফুলটির নাম দেওয়া হয় প্রোটিয়া। দেবতার এই চরিত্রের সাথে ফুলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ফুলটির নাম প্রোটিয়া দেওয়া হয়।



ফ্রান্স: ফ্রান্সের জাতীয় ফুল আইরিস। এই ফুলের তিনটি পাঁপড়ি, যা বুদ্ধি, বিশ্বাস এবং শৌর্যের



প্রতীক। 'আইরিস' শব্দটি গ্রিক, এর অর্থ রংধনু। গ্রিক দেবী আইরিশের নামানুসারে এই ফুলের নামকরণ হয়েছে। ❑

প্রাবন্ধিক

বর্ষার ফুল ও ফল

সানজিদা অপু

আষাঢ়-শ্রাবণ এলে
নামে মেঘের পাল
টাপুর টুপুর বৃষ্টিতে
জাগে নতুন তাল।

সবুজ ঘাসে শিশির মেখে
হাসে ধরণি
বর্ষার রঙে রাঙা হয়
গ্রামের জনপদখানি।

কদম ফুলের গোল গুচ্ছ
দোলে ডালে ডালে
কেয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধ
ভেসে আসে কূলে।

দশম শ্রেণি, রায়েন্দা মডেল স্কুল, বাগেরহাট



বর্ষার ফুল

শিউলি আক্তার

কদম ফুলের হলুদ হাসি
ডালে ডালে ফোটে,
শিশুরা দেখে মুগ্ধ হয়ে
গল্প বলে আর ছোটে।

কেয়া ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ
ছড়িয়ে পড়ে দূরে
প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়
আনন্দেরই সুরে।

ফুলের মাঝে মৌমাছিরা
গেয়ে চলে গান
বর্ষার ফুলে মুগ্ধ হয়
শিশু-কিশোর প্রাণ।

বর্ষার ফল

আরিয়ান ইসলাম সোহান

জামরুল পাকে বাগানজুড়ে
শিশুরা যায় ছুটে
জাম ফল নিয়ে আনন্দে মাতে
ছোট্ট দুটি মুঠে।

আনারসের সোনার মুকুট
বাগানজুড়ে দোলে,
তার মিষ্টি রসের সুখ
হৃদয় ভরে তোলে।

বর্ষার দিনে কাঁঠালের
সুস্বাদু মধুর স্বাদ,
লিচুর স্মৃতি মুছে দিয়ে
আসে নতুন সাধ।

সপ্তম শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

দূষণমুক্ত পৃথিবী

শাহরিয়ার আলম ঋদ্ধ

কালো ধোঁয়ায় আকাশ
আজ হয়েছে ভার
পরিবেশের বুকে
নেমেছে অন্ধকার।

নিয়ম মেনে চলি
সবাই আপন কাজে
দূষণ কমাই আজ
সচেতনতার মাঝে।

যত্রতত্র ময়লা
না ফেলি কোনো দিন
পরিমণনমন থাকুক
পরিবেশ প্রতিদিন।

অষ্টম শ্রেণি, ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ভোলা

পরিবেশ

রাকিব আহমেদ

আসুন সবাই করি
নতুন অঙ্গীকার
পরিবেশ রক্ষায়
সচেতন থাকব বার বার।

সুস্থ পৃথিবী গড়া
হোক সবার কামনা,
প্রকৃতির প্রতি থাকুক
আমাদের অফুরন্ত প্রার্থনা।

গাছ লাগিয়ে ফিরিয়ে আনি
প্রশান্তির শীতলতা
প্রকৃতির সঙ্গে বলি
ভালোবাসার কথা।

দশম শ্রেণি, এসিলাহা উচ্চ বিদ্যালয়, মোড়েলগঞ্জ

বিশ্বকাপ

আরিফ হোসেন সবুজ

বিশ্বকাপের স্বপ্ন নিয়ে
খেলছে সকল টিম,
কেউ পাচ্ছে পয়েন্ট
আর কেউ হচ্ছে হিম।

বৃষ্টি আবার কারো কারো
পয়েন্ট করে শেষ,
এক পয়েন্টের অভাব পড়ে
যায় পিছিয়ে দেশ।

কেউ জানে না বিশ্বকাপে
হবে কাদের জয়,
এ টেনশনে সবার মনে
জাগে শুধু ভয়।



গল্প

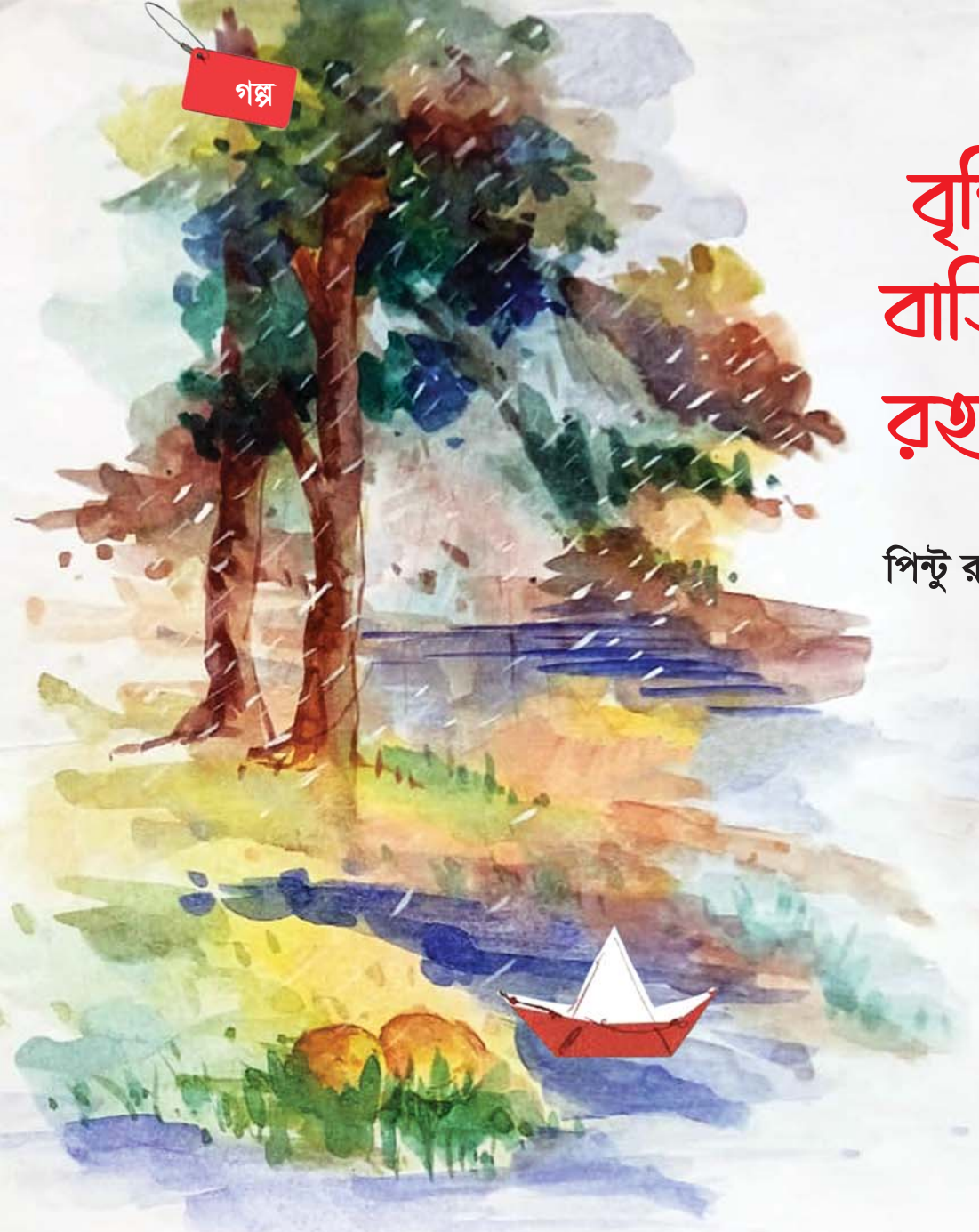

বৃষ্টি বাড়ির রহস্য

পিন্টু রহমান

বৃষ্টি নামলেই টুকটুক দৌড়ে উঠোনে যায়। কাগজের নৌকা ভাসায়। কাদায় লাফায়। আর বৃষ্টির ফোঁটা গুনতে থাকে। কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই মা তাকে বারণ করছিল- বাইরে যাবি না টুকটুক। আজকের এই বৃষ্টি ভালো না।

টুকটুক অবাক। বৃষ্টি আবার ভালো-মন্দ হয় নাকি! মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে- আজকের বৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন রহস্য আছে।

রহস্যের কথা শুনে টুকটুকের চোখ গোল হয়ে যায়। তার মনে কৌতূহল জাগে।

ঠিক তখনই শুরু হয় ঝমঝম বৃষ্টি। অল্প সময়ের মধ্যে চারদিক সাদা হয়ে যায়। বাঁশবাগানের মাথা পর্যন্ত দেখা যায় না। দূরের পথও হারিয়ে গেছে।

টুকটুক জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে- বনের ভেতর একটা ছোট্ট আলো জ্বলছে!

সে চোখ কুঁচকে তাকালো। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কে যেন আলো হাতে হাঁটছে। টুকটুক দৌড়ে গিয়ে তার বন্ধু কাঠবিড়ালি চিকুকে খবর দিল। চিকু তো মহাখুশি। খুশি হয়ে বলে- চল! রহস্য খুঁজতে যাই।

দুজন চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ে। মাথায় কলাপাতা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে থাকে তারা। পথে পানি জমেছে। ব্যাঙেরা ডাকছে- ড্যাঁক ড্যাঁক ড্যাঁক!

বনের কাছে যেতেই ঠান্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগে। বড়ো বড়ো গাছ থেকে টুপটাপ পানি ঝরে। চিকু ফিসফিস করে বলল- ওই দেখ!

দূরে একটা পুরনো ভাঙা ঘর। ঘরটার চাল অর্ধেক ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ভেতরে হলুদ আলো জ্বলছে। টুকটুকের বুকের মধ্যে ধকধক করে ওঠে- এটা কি ভূতের বাড়ি!

চিকুও ভয় পায়। তবু সাহস করে সামনে এগোয়। ঘরের কাছে যেতেই তারা অদ্ভুত এক শব্দ শুনতে পায়- টুপ, টাপ, টুপ, টাপ।

কেউ যেন ধীরে ধীরে হাঁটছে। কড়কড় শব্দে দরজা খুলে যায়। ভয় পেয়ে ওরা চোখ বন্ধ করে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসে- আরে, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন!

চোখ খুলে তারা অবাক!

ভেতরে বসে আছে এক বুড়ো কচ্ছপ। সামনে একটা জ্বলন্ত কুপি। আর চারপাশে ভেজা পাখিরা গা শুকাচ্ছে।

টুকটুক জিজ্ঞেস করে- দাদু! তুমি এখানে কী করছ!

কচ্ছপ মৃদু হেসে বলে- এই ভাঙা ঘরটাই তো আমার বৃষ্টিবাড়ি।

- বৃষ্টিবাড়ি!

- হ্যাঁ। ঝড়বৃষ্টির দিনে যেসব পাখি বা ছোটো প্রাণী আশ্রয় পায় না, তারা এখানে আশ্রয় নেয়।

একটা ভেজা শালিক উড়ে এসে কচ্ছপের পাশে বসে। কচ্ছপ তাকে শুকনো পাতা এগিয়ে দেয়।

চিকুর চোখ চকচক করে ওঠে- তাই তো বলি, আলো জ্বলছিল কেন!

কচ্ছপ জানায়- অন্ধকারে পথ হারালে কেউ যেন ভয় না পায়, তাই আলো জ্বালিয়ে রাখি।

বাইরে তখনো বৃষ্টি ঝরছে। কিন্তু টুকটুকের আর ভয় লাগে না। বরং তার মনে হয়, বৃষ্টিরও একটা সৌন্দর্য আছে?

হঠাৎ বাইরে থেকে কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে- কেউ আছো।

একটা ছোট্ট হরিণছানা বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে। টুকটুক আর চিকু দৌড়ে গিয়ে তাকে ভেতরে নিয়ে আসে। কচ্ছপ হাসতে হাসতে বলে- দেখলে, বৃষ্টিবাড়ির দরজা কখনো বন্ধ থাকে না।

সারা বিকেল তারা গল্প করল। গল্পের মাঝে কেউ শুকনো ফল খায়, কেউ গান ধরে। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি থেমে যায়। আকাশে গোল চাঁদ ওঠে। গাছের পাতায় জমে থাকা পানির ফোঁটায় চাঁদের আলো ঝিলমিল করে।

বাড়ি ফেরার সময় টুকটুক একবার পেছনে ফিরে তাকায়। ভাঙা ঘরটার ছোট্ট আলো তখনো জ্বলছিল। ❑

কথাসাহিত্যিক



নীলগাই কেন নীল নয়

রুবাইয়াত খান

আমাদের চারপাশের প্রকৃতির রঙের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। নদী কিংবা পুকুর পাড়ে বসে থাকা মাছরাঙা পাখির পালকের জাদুকরি নীল রং বা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতির পাখায় উজ্জ্বল নীল নকশা আমাদের মুগ্ধ করে। এছাড়া কীটপতঙ্গ ও পাখিদের জগতে নীল রঙের ছড়াছড়ি দেখা যায়। ছোট্ট বন্ধুরা, একটু ভেবে দেখো, আমাদের চারপাশে বড়ো বড়ো প্রাণী যেমন - কুকুর, বিড়াল, গরু,ছাগল, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ কিংবা বানর কি নীল রঙের দেখা যায়? কিংবা মাছরাঙা পাখির মতো উজ্জ্বল নীল পশমওয়ালা কোনো কুকুর বা বিড়াল কি তুমি কখনো দেখেছ? নিশ্চয়ই না। কিন্তু এমনটা কেন হয়? কেন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে এই নীল রং থাকে না?

এর কারণ হচ্ছে প্রাণিজগতের রং মূলত দুটি উপায়ে তৈরি হয়। প্রথম উপায়টি হলো রঞ্জক পদার্থ বা পিগমেন্ট। আমাদের ত্বক, চুল, পশম বা পাখির পালকে এই পিগমেন্ট থাকে। এই পিগমেন্টের কারণেই নির্দিষ্ট রং তৈরি করে। যেমন ধরো, মেলানিন নামে একটি পিগমেন্টের কারণে কালো রং তৈরি হয়। আবার কারো শরীরে যদি এই পিগমেন্ট একেবারেই না থাকে, তখন তাকে অ্যালবিনো বলে।

এই পিগমেন্ট যেই প্রাণীর দেহে না থাকে সেই প্রাণী হয় সম্পূর্ণ সাদা রঙের।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শরীরে মূলত দুই ধরনের পিগমেন্ট থাকে। যেমন- ইউমেলানিন ও ফিওমেলানিন। ইউমেলানিনের কারণে প্রাণীদের পশমে কালো ও বাদামি রং দেখা যায়। অন্যদিকে ফিওমেলানিনের কারণে তৈরি হয় লালচে-বাদামি আভা, যা আমরা লাল বা হলুদ পশমে দেখতে পাই। এই পিগমেন্টগুলোর নানা রকম মিশ্রণের কারণেই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শরীরে বিভিন্ন শেড, ডোরাকাটা দাগ বা রঙের বৈচিত্র্য তৈরি হয় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রং বদলাতেও পারে। তবে এই পিগমেন্টগুলোর তালিকায় কোনো নীল পিগমেন্ট নেই!

রং তৈরির দ্বিতীয় উপায়টি হলো কাঠামোগত। এখানে কোনো পিগমেন্ট থাকে না; এক্ষেত্রে পশম বা পালকের ভেতরের গঠন বা কাঠামোর ওপর যখন আলো পড়ে, তখন তা এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যে একটি নির্দিষ্ট রঙের মতো দেখায়। প্রজাপতির মতো কীটপতঙ্গ বা ফ্লেমিঙ্গোর মতো পাখিদের ক্ষেত্রে এই কাঠামোগত রঙের ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায়।

আবার ম্যান্ড্রিল নামে এক ধরনের বানরের মুখে সুন্দর নীল রঙের একটা ছোঁয়া দেখা যায়। এখন তোমার মনে হতে পারে, বানরজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে তো রঙের অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমনকি ব্লু মাঙ্কি, ব্লু হোয়েল, ব্লু ওয়াইল্ডবিস্টের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীও তো আছে। তাহলে এদের নাম এমন কেন? আসলে এদের গায়ের রং সত্যিকারের নীল নয়। এদের শরীরের রং মূলত স্লেট পাথরের মতো ধূসর। এই রঙের কারণে নির্দিষ্ট কোনো পরিবেশে প্রাণীকে দূর থেকে দেখলে কিছুটা নীলাভ মনে হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের জেডএসএল লন্ডন চিড়িয়াখানার সিনিয়র কিপার শ্যানন ফারিংটন বলেছেন, মানুষের মতোই অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও তাদের পরিবর্তনের ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণীদের নীল বা সবুজ ত্বক কিংবা গোলাপি চোখ থাকাটা কি তাদের বেঁচে থাকার জন্য খুব জরুরি? তারা বর্তমানে যেমন আছে নীল রং কি তার চেয়েও ভালোভাবে টিকে থাকতে সাহায্য করবে? আসলে হাজার হাজার বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণীরা ঠিক ততটুকুই পেয়েছে, যতটুকু তাদের প্রকৃতির বুকে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ নীল রং তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কোনো বাড়তি সুবিধা দেয় না বলেই প্রকৃতি তাদের নীল রং দেয়নি।

তবে এর মধ্যেও কিছু চমক আছে! ম্যান্ড্রিল নামে এক ধরনের বানরের মুখে খুব সুন্দর নীল রঙের ছোঁয়া দেখা যায়। এখানেও কিন্তু কোনো নীল পিগমেন্ট নেই। ম্যান্ড্রিলের ত্বকের ভেতরের কোষে কোলাজেন প্রোটিনের তন্তুগুলো এমন নিখুঁতভাবে সাজানো থাকে যে সেখানে আলো পড়লেই নীল রং প্রতিফলিত করে। শ্যানন ফারিংটনের মতে, পুরুষ ম্যান্ড্রিলদের মুখ এবং শরীরের পেছনের অংশে নীল ও লালের এই অসাধারণ মিশ্রণ তৈরি হয়েছে মূলত সঙ্গীকে আকর্ষণ করার জন্য এবং নিজেদের আধিপত্য দেখানোর জন্য।

একই ঘটনা দেখা যায় ভারভেট বানরের ক্ষেত্রেও। এদের শরীরেও কাঠামোগত কারণে নীল রং দেখা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় আলোর এই ছড়িয়ে পড়ার নিয়মটিকে বলে টিন্ডাল ইফেক্ট। আকাশ কেন নীল দেখায়, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন; তাঁর নামেই এই ইফেক্টের নাম রাখা হয়েছে। যদিও পরে লর্ড র‍্যালে বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণা করেন। তাই এটি র‍্যালে স্ক্যাটারিং নামেও পরিচিত। মানুষের চোখের মণি যে নীল হয়, তার পেছনেও এই টিন্ডাল ইফেক্টই কাজ করে। মানুষের নীল চোখে কিন্তু কোনো নীল পিগমেন্ট থাকে না!

অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শরীরে নীল রং তৈরির মতো কোনো পিগমেন্ট বা রঞ্জক পদার্থ নেই। তাই এই পৃথিবীতে সত্যিই সম্পূর্ণ নীল রঙের কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। ❑

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

প্রাবন্ধিক

গল্প



রাতুলের লাল ছাতা

মেহেরুন ইসলাম

শাওন, শিবু ও রাতুল একই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। পড়ালেখায়ও মোটামুটি ভালো। ওরা একসাথে খেলে আর একসাথে স্কুলে যায়।

স্কুল থেকে এসেই তিনজনে ছুটে যায় খেলার মাঠে। সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুড়ি ওড়ায়। রাতুল খুব সুন্দর ঘুড়ি বানাতে পারে। সে সবাইকে ঘুড়ি বানিয়ে দেয়। আর সবার থেকে ঘুড়ি বানানোর একেকটা জিনিস চেয়ে নেয়। সবগুলো জিনিস একসাথে করে রাতুল ঘুড়ি বানায়। রাতুলের বাবা দিনমজুর। নুন আনতে পান্তা ফুরায় ওদের। ঘুড়ি কেনার কথা কেমনে বলবে! তবুও একদিন ওর মাকে বলেছিল একটা ঘুড়ি কিনে দিতে। ওর মা কোনো সাড়া দেয়নি। রাতুলও সেদিন ওর মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল। তারপর থেকে রাতুল আর কোনোদিন ঘুড়ি কিনতে চায় না। সবার থেকে জিনিস নিয়ে যে ঘুড়ি বানায় ওটা নিয়েই খেলে রাতুল। মাঝে মাঝে শাওন, শিবুর ঘুড়িও ওড়ায়। একদিন শাওন ঘুড়ি ওড়াতে দিলে অন্যদিন শিবু দেয়। শাওন, শিবু রাতুলের খুব ভালো বন্ধু। ওদের বাড়িও একই গ্রামে তবে সবার বাড়ি এক জায়গায় নয়। শাওন আর শিবু রাতুলকে খুব ভালোবাসে। তাই রাতুলের মন খারাপ হয় না। ওদের সাথে হেসে খেলেই দিন কাটিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে বর্ষাকাল চলে আসে। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয়। দু-দিন হলো রাতুল স্কুলে যায় না। শাওন,শিবু রাতুলকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে যায়। তারপর দুজন মিলে রাতুলের বাড়িতে যায়। রাতুলের বাড়ি গিয়ে শোনে রাতুলের ছাতা নেই, তাই স্কুলে

যায় না। তাছাড়া বই নেওয়ার ব্যাগও নেই। বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে গেলেও বইগুলো ভিজে ছিঁড়ে যাবে। শাওন আর শিবু খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল রাতুলের জন্য। যেভাবে হোক রাতুলকে স্কুলে নিতেই হবে। অবশেষে দুজন মিলে একটা উপায় পেল। রাতুলকে তাদের ছাতার নিচে নিয়ে তবেই স্কুলে যাবে। যেই কথা সেই কাজ। পরদিন সকালে শাওন, শিবু রাতুলের বাড়ি গিয়ে রাতুলকে সাথে নিয়েই স্কুলে যায়। কিন্তু তাদের ছাতা ছোটো হওয়ায় দুইটা ছাতায় তিনজনকে ধরে না। তাই রাতুল ওদের কাছে বই দিয়ে ভিজে ভিজেই স্কুলে গেল। এভাবেই তিনজন মজা করেই স্কুলে যেতে লাগল। কিন্তু তিনদিন যেতে না যেতেই রাতুলের খুব জ্বর হয়। আবারও রাতুল স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

শাওন ও শিবু আবারও চিন্তায় পড়ে যায়। তাদের ভাবনা শুধু রাতুলকে নিয়ে। রাতুলকে তারা বন্ধুবেশে চিরদিনই পাশে পেতে চায়।

রাতুলের খুব বেশি জ্বর হয়। জলপট্টি দিলেও কমে না। অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে তার বাবাও কোনো কাজ করতে পারে না। তাই রাতুলের ঔষধও কিনে দিতে পারে না। কিন্তু শাওন, শিবু বসে নেই। দুজন চারদিনের টিফিনের টাকা জমিয়ে রাতুলকে ঔষধ কিনে দেয়। রাতুল সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু ওরা রাতুলকে আর স্কুলে নিয়ে যায় না।

রাতুল মনমরা হয়ে সারাদিন বাড়ি বসে থাকে। মায়ের নিষেধ থাকায় বৃষ্টিতে আর কোথাও বের হতেও পারে না। শাওন, শিবুকে স্কুলে যেতে দেখে রাতুলের খুব খারাপ লাগে,কান্নাও পায়। মাঝে মাঝে চুপিচুপি কান্নাও করে সে। কিন্তু মাকে বুঝতে দেয় না। কারণ সেদিনের ঘুড়ি চাওয়ার কথা আজও তার মনে পড়ে।

ওদিকে শাওন, শিবু প্রতিদিনের টিফিনের টাকা জমাতে থাকে। স্কুলে গিয়ে তারা কোনো খাবার খায় না। টিফিন টাইমে দুজন ক্লাসে বসে গল্প করে। রাতুলকে ছাড়া ওদের খুব কষ্ট হয়। বৃষ্টির জন্য খেলাধুলা কম হয়, দেখাও কম হয়। আর রাতুল ভাবে শাওন, শিবু হয়ত তাকে ভুলে গেছে।

সে ভাবে তার বুঝি আর কোনোদিন স্কুলে যাওয়া হবে না। শাওন, শিবুর সাথে এক বেঞ্চে বসে আর কখনও গল্প করা হবে না। এসব চিন্তাভাবনা নিয়েই রাতুলের দিন কাটতে থাকে। আর শাওন, শিবু ওরাও কিন্তু বসে নেই। টিফিনের টাকা একটিও খরচ করে না। শুধুমাত্র রাতুলকে একটা ছাতা কিনে দেবে তাই।

এভাবে প্রায় ১০-১৫ দিন কেটে যায়। শাওন, শিবুর ছাতা কেনার টাকাও জমা হয়ে যায়। দুজনে আজ খুবই খুশি। মনে হচ্ছে আজ ওদের ঈদ। দুজন মিলে বাজারে গিয়ে হরি দাদুর দোকান থেকে একটা লাল ছাতা কিনে। লাল রং রাতুলের খুব প্রিয়। লাল ছাতা পেলে রাতুল অনেক খুশি হবে।

দুজন দৌড়াতে দৌড়াতে রাতুলের বাড়ি গেল। চিৎকার করে রাতুলকে ডাকল। রাতুল ঘুমাচ্ছিল। চোখ মুছতে মুছতে বাইরে আসে। শাওন, শিবুকে দেখে রাতুলের আর খুশি ধরে না। ওদের দেখেই খুশিতে কান্না করে দেয়। শাওন বলে ওঠে, 'কী রে বোকা কাঁদছিস কেন? আজ তো তোর খুশির দিন। আমরা তিনজনে আবার একসাথে স্কুলে যাবো।'

রাতুল উত্তরে বলে, বৃষ্টি না কমলে আমি আর স্কুলে যেতে পারব না।

শিবু বলে, 'এই দেখ আমরা তোর জন্য ছাতা কিনে এনেছি। তুই রেডি হয়ে আয়। আমরা তিনজনে আবার একসাথে স্কুলে যাবো।'

লাল ছাতা দেখে নিমিষেই রাতুলের কান্না থেমে যায়। সে খুশিমনে ঘরে গিয়ে রেডি হয় আসে। শিবু রাতুলের হাতে লাল ছাতাটা দেয়। রাতুল ছাতা মেলে মাথার উপর ধরে। তারপর তিন বন্ধু স্কুলের দিকে হাঁটতে থাকে। ❑

সিনিয়র স্টাফ নার্স, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাগেরহাট



অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়

মেজবাউল হক

মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ১১ই জুন দ্বিতীয় ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ জিতল ৫ উইকেটে। এই জয়ে সিরিজ নিশ্চিত হলো মেহেদী হাসান মিরাজের দলের। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটাই প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়। টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে ওয়ানডে সিরিজ জেতা, বাকি কেবল ইংল্যান্ডের সঙ্গে। এই নিয়ে টানা চারটি ওয়ানডে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ।

জেতার কাজ অবশ্য করে রেখেছিলেন বোলাররাই। তাদের বোলিংয়ের তোপে অস্ট্রেলিয়া পেল না লড়াইয়ের পুঁজি। মামুলি লক্ষ্যে শুরুর ধাক্কা সামলে একাদশে ফেরা সৌম্য সরকার আর নাজমুল হোসেন শান্ত টানলেন দলকে। পরে নিরাপদে তরি ভেড়ালেন তাওহিদ হৃদয়। ৩৬ বল আগে ম্যাচ শেষ করে হৃদয় অপরাজিত থাকলেন ৫৫ বলে ৪০ রান করে। মিরাজ করলেন ২২ বলে ২২। এর আগে শুরুর চাপ সামলে সৌম্য করেন ৪৭ বলে ৪২, শান্তর ব্যাট থেকে আসে ৫৩ বলে ৪২।

'ডিএলএস মেথডে' ১৯২ রান তাড়ায় প্রথম বলেই জোরালো আবেদনে বেঁচে যাওয়া তানজিদ হাসান তামিম কুপোকাত পরের বলে। দ্বিতীয় উইকেটে দুজনে মিলে যোগ করেন ৯৩ বলে ৮৬। থিতু থাকা সৌম্য এগোচ্ছিলেন ফিফটির দিকে। ৪৭ বলে ৫ চার, ২ ছক্কায় থামেন ৪২ করে। খানিক পর ৪২ রানে থামেন শান্তও। মেরেডিথের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান তিনি। আগের ম্যাচের হিরো মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত দ্রুত রান বাড়ানোর তালে ছিলেন। এবার থিতু হয়ে এগোতে পারেননি। ১৪ বলে ১৫ রান করে ক্যাচ দেন জাম্পার বলে। তাতে অবশ্য বিপদের কিছু হয়নি। অধিনায়ক মিরাজকে পাশে নিয়ে বাকি রান তুলে নেন হৃদয়। প্রথমে একটু ধীরলয়ে খেলে পরিস্থিতি শান্ত করেন, পরে অনায়াসে রান বাড়িয়ে খেলা শেষ করেন দুজন।

এর আগে সকালে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস হয়ে যায় তাসের ঘর। কোনো রান করার আগেই তারা হারিয়ে ফেলে ৩ উইকেট। ওয়ানডে ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটল চতুর্থবার, অজিদের জন্য এমন পরিস্থিতিতে এই প্রথম। এমন বিপর্যয়ে পড়ার পরই মূলত ম্যাচ অনেকটা মুঠোয় চলে এসেছিল বাংলাদেশের। তাসকিন নতুন স্পেনে পরপর দুই বলে উইকেট নেয়। এই জুটি ভাঙার পর নামে বৃষ্টি। প্রায় তিন ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকার পর ডিএলএস মেথডে ১৯২ রানের লক্ষ দাঁড়ায় বাংলাদেশের। সেটা তুলে নিতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি।











বিশ্ব কীটপতঙ্গ দিবস

রামিসা হক

প্রতি বছর ৬ই জুন পালিত হয় বিশ্ব কীটপতঙ্গ দিবস। ২০১৭ সালে চীনা পেস্ট কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশন জনস্বাস্থ্য রক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে এই দিনটি পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া এটি প্রকৃতিতে ইকোসিস্টেম রক্ষা এবং ফসল উৎপাদনে খুদে এই জীবগুলোর অবদানকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্র প্রাণী কীটপতঙ্গ। এই কীটপতঙ্গের জগতটা খুবই বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কীটপতঙ্গের রয়েছে প্রায় দশ লাখ প্রজাতি। এর বাইরেও নতুন নতুন প্রজাতি আবিষ্কার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব কীটপতঙ্গের মধ্যে একটি বড়ো অংশ রয়েছে যারা মানুষ ও প্রকৃতির জন্য বেশ উপকারী। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের বিচরণ। প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আগমন ঘটে। এরপর বড়ো একটা সময়জুড়ে পৃথিবীতে এদের আধিপত্য ছিল। ওই সময় কীটপতঙ্গ আকারেও বেশ বড়ো ছিল, এক একটি গঙ্গাফড়িং ছিল গাংচিল পাখির সমান। কালক্রমে বিবর্তনের ধারায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী, কমতে থাকে কীটপতঙ্গের প্রভাব।

আকারে ছোটো হয়ে গেলেও প্রজাতি বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্যে এদের জুড়ি নেই। প্রাণিজগতে সবচেয়ে বেশি প্রজাতি আছে কীটপতঙ্গ শ্রেণিতে। ছোটো পিঁপড়া থেকে শুরু করে ঘরের কোণের আরশোলা এবং বাহারি প্রজাপতি ও ঘাসফড়িং সবই কীটপতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এ প্রাণীগুলো হয়ে উঠেছে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝে যে আন্তঃসম্পর্ক ও খাদ্যজাল গড়ে

উঠেছে তা কীটপতঙ্গ ছাড়া ভাবাই যায় না। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, পৃথিবীতে যদি পোকামাকড় না থাকে তবে খাদ্যাভাবে মরতে হবে মানবজাতিকে।

গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কীটপতঙ্গগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়:

- কোলিওপটেরা (Coleoptera): এটি সবচেয়ে বড়ো দল, যেমন- সব ধরনের গুবরে পোকা।
- লেপিডোপ্টেরা (Lepidoptera): ডানাযুক্ত পোকা, যেমন- প্রজাপতি এবং মথ।
- হাইমেনোপ্টেরা (Hymenoptera): সামাজিক পতঙ্গ, যেমন- মৌমাছি, পিঁপড়া এবং বোলতা।
- ডিপ্টেরা (Diptera): ডানা ও মাছির দল, যেমন- মৌমাছি, মশা এবং সাধারণ মাছি।
- হেমিপ্টেরা (Hemiptera): প্রকৃত পোকা, যেমন- ছারপোকা।
- অর্থোপ্টেরা (Orthoptera): লাফালাফি করা পোকা, যেমন- ফড়িং ও ঘাসফড়িং।

বছরে বিশ্বের ২৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ খাদ্য উৎপাদন পরাগায়নের জন্য বাতাসের উপর নির্ভরশীল হলেও অনেক খাদ্যশস্য আছে যেগুলো পরাগায়নের জন্য পোকামাকড়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে তারা হারিয়ে গেলে কৃষকরা বিপাকে পড়বেন।

প্রকৃতিতে কীটপতঙ্গের প্রধান ভূমিকাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

পরাগায়ন (Pollination): মৌমাছি, প্রজাপতি ও বিভিন্ন ধরনের মাছি ফুল থেকে ফুলে উড়ে মধু সংগ্রহের সময় অজান্তেই পরাগায়ন ঘটায়। এর ফলে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং ফল ও বীজ তৈরি হয়, যা মানবজাতি ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যের জোগান দেয়।

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও পচনক্রিয়া: উইপোকা, গুবরে পোকা এবং বিভিন্ন মাটির পোকা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ খেয়ে ফেলে। এরপর মলত্যাগের মাধ্যমে তারা মাটিতে পুষ্টি উপাদান ও সার ফিরিয়ে দেয়, যা মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

খাদ্য শৃঙ্খলে ভূমিকা: পাখি, টিকটিকি, ব্যাঙ এবং বিভিন্ন ছোটো স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রধান খাদ্য হলো এই কীটপতঙ্গ। এদের অনুপস্থিতিতে পুরো বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম ভেঙে পড়তে পারে।

কীটপতঙ্গ দমন (Pest Control): অনেক উপকারী পোকা, যেমন- লেডিবার্ড বিটল এবং বোলতা, ফসলের জন্য ক্ষতিকর এমন পোকা (যেমন- জাব পোকা) খেয়ে ফেলে। এটি প্রাকৃতিকভাবে ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

বীজ ছড়ানো: কিছু পিঁপড়া ও গুবরে পোকা উদ্ভিদের বীজ মাটির নিচে বা নতুন স্থানে বয়ে নিয়ে যায়, যা নতুন গাছ জন্মানোয় ভূমিকা রাখে।

কীটপতঙ্গকে আমরা সাধারণত ক্ষতিকর হিসেবে জানলেও প্রকৃতিতে রয়েছে এদের অপরিসীম উপকারী ভূমিকা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মৌমাছি, প্রজাপতি, রেশমকীট, পিঁপড়া, ঘাসফড়িং ইত্যাদি।

- মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে এবং মৌচাকে জমা করে। এ মধু আর মোম অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এই বিশেষ পতঙ্গটি একশটির বেশি ফসলের মধ্যে সত্তরটিরও বেশিতে পরাগায়ন করে থাকে। এই বিবেচনায় মৌমাছি একটি অতি উপকারী পতঙ্গ।
- রেশমকীট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পতঙ্গ। রেশমকীট পালনের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয় রেশম সুতা যা থেকে মূল্যবান বস্ত্রসামগ্রী তৈরি হয়।
- কীটপতঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো প্রজাপতি ও ঘাসফড়িং। রং-বেরঙের প্রজাপতির ওড়াওড়ি নিমিষেই মুগ্ধ করে মানুষকে। ফুলে ফুলে ঘুরে পরাগায়নের মাধ্যমে পরিবেশের জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে এদের ভূমিকা অপরিসীম।
- পরিবেশবান্ধব ছোটো জীব ফড়িং জলাশয়ের পোকা-মাকড় ও মশার লার্ভা খেয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের পরিবেশকে ভালো রাখতে সহায়তা করে। পূর্ণবয়স্ক ফড়িং উড়ন্ত অবস্থায় শিকার করে। ফড়িং একাধারে বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষতিকর মশা দমন, ফসল ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনেও ভূমিকা রাখে।

- পতঙ্গের আরেকটি সুপরিচিত দল পিঁপড়া। এরা মাটির গর্তে, গাছের কোটরে বাসা বানায়। আমাদের উচ্ছিষ্ট খাবার এবং অন্য মৃত পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে।

কীটপতঙ্গের বিলুপ্তির কারণ

কীটপতঙ্গের বিপন্ন হওয়ার পেছনে বিজ্ঞানীরা চারটি প্রধান কারণ খুঁজে বের করেছেন। এগুলো হচ্ছে-

- আবাসস্থল ধ্বংস, তৃণভূমি ও বনভূমি পরিবর্তন করে কৃষি জমি তৈরি করা। পাশাপাশি বাড়ছে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, যার ফলে বিপন্ন হচ্ছে পতঙ্গকুল। কীটপতঙ্গের খাদ্য ও প্রজননের জন্য যে ধরনের আবাসস্থল প্রয়োজন তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।
- পরিবেশ দূষণ, অধিক হারে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ত্বরান্বিত করছে বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি। কৃষিতে অধিক উৎপাদনের আশায় ক্ষতিকর পতঙ্গের পাশাপাশি আমরা মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে উপকারী পতঙ্গও ধ্বংস করছি।
- জৈবিক সমস্যা, ভিনদেশি আগ্রাসী প্রজাতির দ্বারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কীটপতঙ্গ। এক প্রতিবেশের প্রাণী অন্য প্রতিবেশে স্থানান্তরের মাধ্যমে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে অসংখ্য পতঙ্গ।
- বর্তমান সময়ে অন্যতম আলোচিত সমস্যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনে একদিকে যেমন বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তেমনি বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে বেশি সংখ্যক পতঙ্গের প্রজাতি।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অনেক পোকামাকড়ের জন্য কঠিন ব্যাপার। যেমন- ভোমরা মূলত ঠান্ডা এবং স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে অভ্যস্ত। গরম আবহাওয়ায় টিকে থাকা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আবার ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েও যেতে পারে, যা কৃষকের বিপদ বাড়িয়ে দেয়।

সব কীটপতঙ্গ আমাদের বন্ধু নয়। কিছু ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ফসলের ক্ষতি করে এবং রোগ ছড়ায়। তাই পরিবেশের ক্ষতি না করে কীভাবে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেই সঠিক উপায় বা বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম মেনে উপকারী কীটপতঙ্গকে রক্ষা করতে হবে এবং ক্ষতিকর বালাই নিয়ন্ত্রণে সচেতন হতে হবে। পরিবেশ সুস্থ থাকলে আমরাও সুস্থ থাকব।

পৃথিবীর মোট প্রাণীর অর্ধেকেরও বেশি হলো কীটপতঙ্গ। এরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, পরাগায়ন এবং মৃতদেহ পচাতে সাহায্য করে। ডাইনোসরের আমলের চেয়েও আগে থেকে পৃথিবীতে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। পোকামাকড় ছাড়া পৃথিবীতে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়বে এবং মানবজাতি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। ❑



প্রাবন্ধিক



তনিমার আকাশছোঁয়া সাফল্য

আতিকুল ইসলাম

সালটা ১৯৯৭। দেশে তখনো স্যাটেলাইট চ্যানেলের এত ছড়াছড়ি নেই, সাদা-কালো পিকচার টিউবের বিটিভিই মানুষের বিনোদন আর খবরের প্রধান ভরসা। একদিন টিভির পর্দায় খবর আসলো-আমেরিকা মঙ্গলগ্রহে 'পাথফাইন্ডার' নামের এক রোবট পাঠিয়েছে! খবরটি শুনে এক সাধারণ গৃহিণী মা বিস্ময়ে তার ৫ বছরের ছোট্ট মেয়েকে মঙ্গলের গল্প শোনালেন। মায়ের উচ্ছ্বসিত চোখমুখ দেখে ছোট্ট মেয়েটি সেদিনই বুঝেছিল, পৃথিবীর বাইরেও বিশাল এক জগৎ আছে। আর সেদিনই সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল, বড়ো হয়ে সে মহাকাশ নিয়েই পড়বে!

গল্পের মতো শোনালেও, এটি কোনো সিনেমার গল্প নয়। এটি আমাদের বাংলাদেশের মেয়ে তনিমা তাসনিম অনন্যার বাস্তব জীবনের গল্প। মায়ের কাছে শোনা সেই মঙ্গলের গল্প বুকে ধারণ করে, আজ তিনি বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন!

যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য বিজ্ঞানভিত্তিক গণমাধ্যম 'সায়েন্স নিউজ' (Science News) ২০১৪ সাল থেকে ৪০ বছরের কম বয়সি বিশ্বের সেরা ১০ জন উদীয়মান বিজ্ঞানীর তালিকা (SN-10) প্রকাশ করে আসছে। আর অবাক করা বিষয় হলো, বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের পেছনে ফেলে এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন আমাদের ২৯ বছর বয়সি অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট তনিমা!

মহাকাশের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু হলো ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর, যেখান থেকে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। এটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণাও ছিল কেবলই তত্ত্বভিত্তিক। কিন্তু তনিমা যুগান্তকারী কাজ করেছে। তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এই সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলগুলোর অসাধারণ কিছু চিত্র তৈরি করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে এই ব্ল্যাকহোলগুলো শক্তি সঞ্চয় করে, কীভাবে বেড়ে ওঠে এবং মহাকাশের পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

গবেষণার পথে বাধা যে আসেনি তা নয়। টেলিস্কোপের তথ্যে যখন অমিল দেখা দিত, তখন তিনি নিজেই

একটি ‘নিউরাল নেটওয়ার্ক’ তৈরি করে ফেলেন! তাঁর এই নাছোড়বান্দা মনোভাবের কারণেই আজ বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নতুন এক দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে।

ছোটোবেলা থেকেই মেধাবী তনিমা ২০০৮ সালে আমেরিকায় পাড়ি জমান। ব্রায়ান মাওর কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্কলারশিপ নিয়ে স্নাতক শেষে, বিখ্যাত ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। শুধু তাই নয়, নাসায় (NASA) ইন্টার্নশিপ করার সময় হাবল টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ‘ওরিয়ন নেবুলা’-র চিত্র তৈরি করে বিজ্ঞানীদের নজর কাড়েন তিনি। ২০১২ সালে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ইউরোপিয়ান পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা সার্ন (CERN)-এর সাথে কাজ করার বিরল সৌভাগ্যও অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার ডার্থ মাওথ কলেজে পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করছেন।

তনিমার এই আকাশছোঁয়া সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল তার পরিবারের। তারা মেয়ের স্বপ্নকে ডানা মেলতে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে এমন অনেক ‘তনিমা’ ছড়িয়ে আছে, যাদের মেধা আছে কিন্তু সঠিক পরিচর্যা ও সুযোগের অভাবে তারা হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আর পরিবারগুলো যদি একটু সচেতন হয়, তবে হয়ত এমন প্রতিভাবানদের আর দেশ ছাড়তে হবে না। দেশের মাটিতে বসেই তারা বিশ্বজয় করতে পারবে।

বাংলার এই দামাল মেয়ের বিশ্বজয়ের গল্পটি সবাইকে জানাতে হবে। তবেই তো আরেকটি ছোট্ট শিশু বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখবে! ❑

শিক্ষার্থী

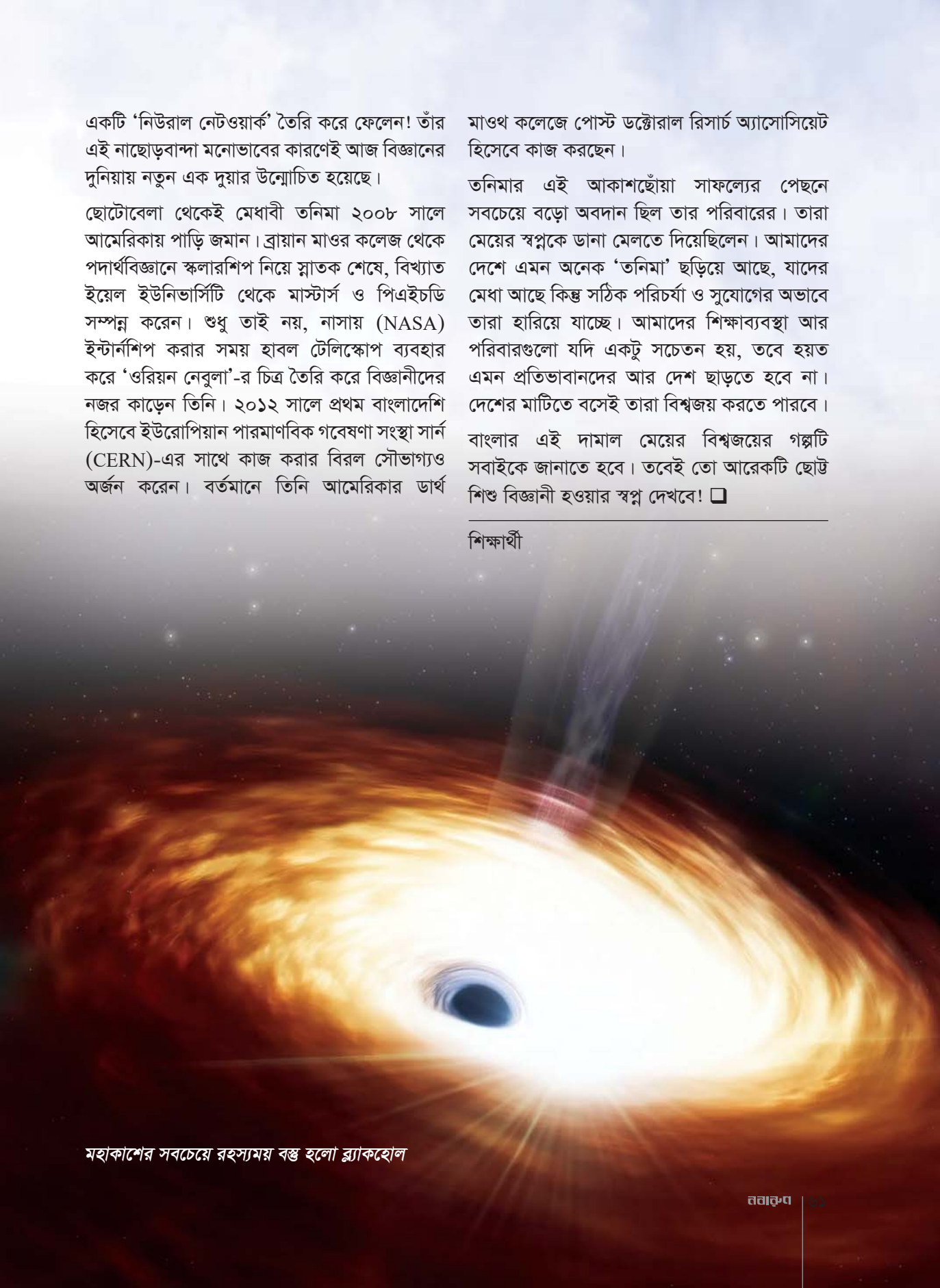

মহাকাশের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু হলো ব্ল্যাকহোল

সবুজ রহস্যের মায়াজালে

লাইজু চৌধুরী

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি এমন কোনো জায়গার কথা কল্পনা করতে পারো, যেখানে গাছপালা এত ঘন যে মাটিতে সূর্যের আলোই পৌঁছায় না? যেখানে নদীর নিচে লুকিয়ে থাকে দানবীয় অ্যানাকোন্ডা, আর গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় রঙিন সব পাখি? এটি কোনো রূপকথার গল্প নয়, পৃথিবীতে সত্যি সত্যিই এমন এক জায়গা আছে, যাকে বলা হয় আমাজন রেইনফরেস্ট বা আমাজনের জঙ্গল। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এবং রহস্যময় বন।

চলো আজকে আমরা ঘুরে আসি সবুজ রহস্যের মায়াজালের এই জাদুকরী রাজ্য থেকে!

আমাজন হলো এ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও রহস্যেঘেরা বন। এখানে এমন কিছু অমীমাংসিত রহস্য ও বিস্ময় রয়েছে যা বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করেও উদঘাটন করতে পারেনি। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বছর পূর্বে সৃষ্টি হওয়া এ বনের ৭০% জায়গাতেই মানুষের এখনো পা পড়েনি। এ ৭০% জায়গাতে কী আছে বা দেখতে কেমন, তার কিছুই এখনো পৃথিবীবাসীর কেউ জানে না। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীবিধৌত অঞ্চলে নয়টি দেশজুড়ে অবস্থিত। দেশগুলো হলো- ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম, ফ্রেঞ্চ গায়ানা এবং ইকুয়েডর। এর আয়তন প্রায় ৫৫ থেকে ৬৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (সঙ্গায়নের ভিন্নতা অনুযায়ী পরিমাপ ভিন্ন)।

আমাজনকে কেন 'পৃথিবীর ফুসফুস' বলা হয়?

তোমরা তো জানোই, বেঁচে থাকার জন্য আমাদের অক্সিজেন কতটা প্রয়োজন। আমাজন জঙ্গল এতই বিশাল যে, আমাদের পুরো পৃথিবীর প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অনেক অংশই আসে এই এক বন থেকে! কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে পৃথিবীকে ঠান্ডা রাখতে এর জুড়ি নেই। ঠিক যেমন আমাদের ফুসফুস আমাদের শ্বাস নিতে সাহায্য করে, তেমনি আমাজনও পুরো পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই একে বলা হয় 'পৃথিবীর ফুসফুস'।

আমাজনের গাছগুলো একেকটা দানবের মতো বড়ো, প্রায় ১৩০ থেকে ২০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়! এই গাছগুলোর পাতা আর ডালপালা ওপরের আকাশে এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে যে, তারা যেন একটা বিশাল ছাতা তৈরি করে। একে বলে 'ক্যানোপি'। এই ছাতার কারণে সূর্যের আলো বনের ভেতরের মাটিতে পৌঁছাতে পারে না। বনের প্রায় ৯৯% অংশই থাকে অন্ধকার! এমনকি আমাজনে যখন বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির পানি ওপরের পাতা ভেদ করে মাটিতে পৌঁছাতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লেগে যায়! ভাবো একবার, কতটা ঘন সেই জঙ্গল!



অদ্ভুত আর ভয়ংকর সব প্রাণীর মেলা

আমাজন যেন এক জীবন্ত চিড়িয়াখানা। তবে এখানকার প্রাণীরা খাঁচায় থাকে না, বুক ফুলিয়ে রাজত্ব করে বেড়ায়। এখানে দেখা মেলে এমন কিছু প্রাণীর, যাদের নাম শুনলেই গায়ের লোম খাঁড়া হয়ে যায়।

জাগুয়ার: আমাজনের সবচেয়ে বড়ো শিকারি বিড়ালজাতীয় প্রাণী জাগুয়ার। এরা যেমন চটপটে, তেমনই চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে।

অ্যানাকোন্ডা: পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আর ভারী সাপ। এরা বিষাক্ত নয়, কিন্তু এদের শক্তি এত বেশি যে আস্ত একটা হরিণ বা মানুষকে পেঁচিয়ে ধরে গিলে ফেলতে পারে!

গোলাপি ডলফিন: নদীতে তোমরা ধূসর ডলফিন দেখেছ নিশ্চয়ই? কিন্তু আমাজন নদীতে বাস করে অদ্ভুত সুন্দর এক গোলাপি রঙের ডলফিন!

পিরানহা: এই পুঁচকে মাছগুলোর দাঁত ছুরির চেয়েও ধারালো। একঝাঁক পিরানহা কয়েক মিনিটের মধ্যে আস্ত একটা গরুকে কঙ্কাল বানিয়ে দিতে পারে।

পয়জন ডার্ট ফ্রগ: দেখতে যেমন সুন্দর আর উজ্জ্বল রঙের, তেমনই ভয়ংকর। এই ব্যাঙের গায়ের চামড়ায় এত তীব্র বিষ থাকে যে, একটা ব্যাঙের বিষে ১০ জন মানুষ মারা যেতে পারে!

এ জঙ্গলে প্রায় ২৫ লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গ, ১৩০০ প্রজাতির পাখি, ৪০০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪০০ এর বেশি উভচর, ৩০০০ প্রজাতির গাছ, ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ হাজারো প্রজাতির অজানা জীব বসবাস করে।

আমাজন নদী

আমাজন বনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে আমাজন নদী। পানি প্রবাহ ও আয়তনের দিক থেকে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডেও এটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। এই আমাজন নদীই হলো এ বনের জীবনীশক্তি ও রসদের উৎস।

সানাই টিমপিসকা নদী

আমাজনের যে অংশ পেরুতে পড়েছে সেখানে Shanay Timpishka নামক একটি অদ্ভুত নদী রয়েছে। পুরো পৃথিবীজুড়ে এমন নদী শুধু একটিই আছে। এ নদীর পানি অনেক গরম এবং সব সময় ফুটতে থাকে। এ নদীর পানি এতটাই গরম যে এতে ডুব দিলে মানুষ মারা যেতে পারে। এ নদীর তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে প্রায় ৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে।

আমাজনের আদিবাসী ও হারিয়ে যাওয়া শহর

এই ভয়ংকর জঙ্গলে শুধু পশুপাখিই থাকে না, থাকে মানুষও। আমাজনে প্রায় ৪০০টিরও বেশি আদিবাসী উপজাতি বাস করে। এদের মধ্যে এমন কিছু উপজাতি আছে, যারা বাইরের পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখেনি এবং আধুনিক দুনিয়া সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই! তারা বনের ফলমূল আর শিকার করেই বেঁচে থাকে।

অনেকে বিশ্বাস করেন, এই ঘন জঙ্গলের নিচে লুকিয়ে আছে প্রাচীন কোনো সভ্যতার স্বর্ণালি শহর, যার নাম 'এল ডোরাডো'। বহু অভিযাত্রী এই গুপ্তধনের শহরের খোঁজে আমাজনে গিয়ে আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। আমাজনের এই রহস্য আজও মানুষ ভেদ করতে পারেনি।

বন্ধুরা, পৃথিবীর এই সবচেয়ে সুন্দর আর রহস্যময় বনটি কিন্তু এখন ভালো নেই। পৃথিবীর পরিবেশ ও আবহাওয়ার জন্য আমাজনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যদি আমাজন না থাকে তবে পৃথিবীতে কার্বন শোষণ ক্ষমতা কমে যাওয়া, বিশ্ব উষ্ণায়ন, আর্কটিক ও আটলান্টিক বরফ গলন, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ভয়াবহ বন্যাসহ আরো মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে পৃথিবীতে। মানুষ নিজেদের স্বার্থে প্রতিদিন হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলছে, বনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এভাবে গাছ কাটতে থাকলে বনের পশুপাখিরা ঘরছাড়া হয়ে যাবে, আর পৃথিবী পড়বে এক মস্ত বড়ো বিপদে। আমাজনকে বাঁচানো মানে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে বাঁচানো। প্রকৃতির এই রহস্যময় উপহারকে ভালোবেসে একে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার! মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি যে কত বড়ো, কত সুন্দর, কত রহস্যময় আর কত নিখুঁত তা পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় এ আমাজন বনকে দেখে। ❑

প্রাবন্ধিক



নূর এ মাহদী নবী আভা, অষ্টম শ্রেণি, ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বগুড়া



সাজ্জাদ হোসেন শান্ত, অষ্টম শ্রেণি, সন্দ্বীপ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী



রায়হান কামাল, নবম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা



সাইফান মাসুদ আলী, ষষ্ঠ শ্রেণি, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-12. June 2026, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



তুবা ইয়াসমিন হিয়া, দশম শ্রেণি, লালকুঠি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা